গুরুবাদ-ঋষিবাদ

শ্রীঅনিল কুমার গঙ্গোপাধ্যায়
প্রতিঋত্বিক।

মুখবন্ধ

ইষ্টস্বার্থ ও প্রতিষ্ঠা-বিষয়ক কার্য্য লইয়া চলিবার পথে সর্ব্বত্র এই প্রকার একখানি গ্রন্থের অভাব বিশেষভাবে অনুভব করিয়াছি এবং সর্ব্বত্র প্রায় সকলের নিকট হইতেই এইরূপ অভাবের কথাও আমার কর্ণগোচর হইয়াছে। যদিও দুঃখের বিষয় তথাপি বলিতে হয় যে, ঋষি-অনুশাসিত এই আর্য্যাবর্ত্তের বহু আর্য্যসন্তানগণের মধ্যে 'গুরুবাদ', 'জীবন্ত আদর্শবাদ' বা 'ঋষিবাদ' এখনও একটা বড় সমস্যা, যাহার সমাধানে এইরূপ গ্রন্থের বিশেষ প্রয়োজন। তাই এই গ্রন্থখানি আমার ক্ষুদ্র শক্তি ও সামর্থ্য দিয়া আপ্রাণ চেষ্টা-সহকারে লিখিয়াছি। 'গুরুবাদ' সম্বন্ধে শ্রীশ্রীঠাকুরের বাণী এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বহু শাস্ত্র, মহাপুরুষ, ঋষি, বৈজ্ঞানিক ও মনীষিগণের সমর্থনী বাণী ইহাতে বিষদভাবে সন্নিবেশিত হইয়াছে। জনগণের ভিতর গুরুবাদ—জীবন্ত-আদর্শবাদ চারিয়ে দিবার পক্ষে গ্রন্থখানি কর্ম্মিগণের চলার পথের সাথী হইলে আমার শ্রম সার্থক হইবে।

সৎসঙ্গ আশ্রম
বৈদ্যনাথধাম (এস্-পি),
১লা বৈশাখ, ১৩৬৮।

শ্রীঅনিলকুমার গাঙ্গুলী।

গুরুবাদ-ঋষিবাদ

(পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত তৃতীয় সংস্করণ)

শ্রীঅনিলকুমার গাঙ্গুলী

মূল্য—এক টাকা মাত্র

সূচীপত্র

গুরুবাদ—ঋষিবাদ

মানুষের জীবনে যে কোন জ্ঞানলাভ করিতে হইলে গুরুর বা জীবন্ত আদর্শের প্রয়োজন আছে। আমরা যখন যে কোন জ্ঞানলাভ করি, তাহা কোন প্রত্যক্ষ বস্তু বা ব্যক্তির নিকট হইতেই লাভ করি। প্রত্যক্ষ বস্তু বা ব্যক্তি ব্যতীত কোন জ্ঞান আমরা লাভ করিতে পারি না। যদি আমরা একটু চিন্তা করি তাহা হইলে দেখিতে পাইব যে, মানুষ জন্মগ্রহণের পর বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যে কোন জ্ঞানলাভ করে তাহা যিনি যে বিষয়ে অভিজ্ঞ, তাহার নিকট হইতেই লাভ করিয়া থাকে।

জাগতিক বিদ্যা বা জ্ঞানকে অবিদ্যা বলে এবং পারমার্থিক জ্ঞানকে পরাবিদ্যা বলে। অবিদ্যালাভে গুরুর প্রয়োজন স্বীকার করিলেও পরাবিদ্যালাভ করিতে হইলে গুরুর যে কোন প্রয়োজন আছে ইহা অনেকে স্বীকার করিতে চাহেন না, বরং আরও বলিয়া থাকেন যে, পরাবিদ্যা অর্থাৎ পারমার্থিক জ্ঞানের

বীজ যখন আমাদের মধ্যে আছে তখন একদিন উদ্বুদ্ধ হইবেই। কিন্তু ইহা ভাবিয়া দেখেন না যে, পুস্তকে জ্ঞানের বিষয় সব কিছু লিপিবদ্ধ থাকিলেও শিক্ষককে বাদ দিয়া পুস্তকে লিপিবদ্ধ জ্ঞান লাভ করা সম্ভব নয়।

এই গুরুবাদ না মানিয়া চলিবার ফলে আমরা আজ ব্যক্তিগত জীবনে, দাম্পত্য জীবনে, পারিবারিক জীবনে, সামাজিক জীবনে ও রাষ্ট্রীয় জীবনে প্রতিনিয়ত বিপদ, অশান্তি, বিশৃঙ্খলা ও বিপর্যায়ে বিধ্বস্ত ও বিনষ্ট হইতেছি—অবশেষে দিশেহারা হইয়া পথের সন্ধানে ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছি।

ইহা অতি সহজ চিন্তায় বুঝা যায় যে, যদি কোন ব্যক্তি আলো ব্যতিরেকে অন্ধকারে ভ্রমণ করে এবং ভ্রমণের নিরাপত্তার জন্য সে যত ভাল অস্ত্রদ্বারা সজ্জিত থাকুক না কেন, তাহার চলিবার পথে অন্ধকারে না দেখার জন্য সে গর্ত্তে পড়িতে পারে, কিন্তু অন্ধকারে চলিবার সময় সে যদি আলো লইয়া চলে, তাহা হইলে তাহার অন্ধকারে না দেখার জন্য কোন বিপদের সম্ভাবনা থাকে না। তদ্রূপ আমাদের জীবনে অজ্ঞানতারূপ অন্ধকারে (অর্থাৎ অজানার পথে) যদি কোন সর্ব্বজ্ঞ অর্থাৎ সব-জানা মহাপুরুষকে জীবনের সারথিরূপে গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে মানিয়া চলি, তাহা হইলে তাঁহার জ্ঞানালোকে আমরা নিরাপদে চলিতে পারি। তাহা হইলে কি ব্যক্তিগত জীবন, কি দাম্পত্য-জীবন, কি পারিবারিক জীবন, কি রাষ্ট্রীয় জীবনে আমরা অশান্তি, বিশৃঙ্খলা বা বিপর্যায়ে বিনষ্ট বা বিধ্বস্ত হই না। সুতরাং গুরুর যে বিশেষ

প্রয়োজন আছে, ইহার দ্বারা সহজেই উপলব্ধি করা যায়। এ সম্বন্ধে শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র বলিয়াছেন—

"বিপাক পথে হাত ধ'রে যে
চলার কায়দা জানিয়ে দেয়,
তাঁকেই জানিস্ গুরু ব'লে
তাঁকে পেলে নাইকো ভয়।"

কাহাকেও গুরু বলিয়া স্বীকার করা বা গ্রহণ করা মানেই দীক্ষা গ্রহণ করা, গুরুর নির্দ্দেশানুসারে নাম ও বীজমন্ত্র জপ করা ও চলা। এ সম্বন্ধে শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র বলিয়াছেন—

"আমাদের system-এর (শরীর-বিধানের) ভিতর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার দরুণ প্রতিনিয়তই যে সমস্ত শব্দ স্বভাবতঃই ধ্বনিত হচ্ছে তাকেই নাম বা বীজ বলে। এই নামের স্থূল-সূক্ষ্ম হিসাবে স্তর-ভেদ আছে। হ্রীং, ক্লী, ওঁ, রং প্রভৃতি প্রত্যেকেই এক-একটি স্পন্দন। আমাদের brain-cells (মস্তিষ্ক-কোষ)-গুলি বহির্ম্মুখীন প্রবৃত্তির চাপে মুদ্রিত থাকে, কোন বীজমন্ত্র মনোযোগের সহিত মনে মনে উচ্চারণের ফলে, আমাদের স্নায়ুর উপর ক্রিয়া করিয়া মস্তিকের কোষগুলিকে উত্তেজিত করিয়া তোলে, সেগুলি পূর্ব্বের চেয়ে অধিক সাড়াপ্রবণ হয়, cells (কোষ)-গুলি ফুটে ওঠে, যাহা পূর্ব্বে বোঝা কঠিন হ'ত তাহা তখন সহজে বুঝা যায়, বুদ্ধি বিকশিত হয়, জ্ঞানের দরজার যেন চাবি খুলে যায়।

কি করে করতে হয়, কি ভাবে করতে হয় তা যিনি জানেন তাঁর কাছ থেকে জেনে নিতে হয়। আর সেই নিয়মেই তাঁর প্রতি কর্ম্মময় অনুরাগ নিয়ে নামজপ চালাতে হয়।"

আধুনিক মনোবিজ্ঞানের ভাষায় বলিতে হয়—"perception of light and sound is due to auto-stimula-

tion of the auditory and optic nerve centres in the cerebrum". অর্থাৎ চৈতন্য বা দয়াল-দেশের অডিটরী ও অপটিক স্নায়ুকেন্দ্র স্বতঃ উত্তেজিত হইবার ফলে শব্দ ও জ্যোতির উপলব্ধি হয়।

মহাপুরুষ কবীরও বলিয়াছেন—

"ফাকির খেলা নাইকো সেথা শব্দ জাগে যেথা।
সীমার মাঝে অসীম রহে জ্ঞানের সাথে সেথা॥"

এখন চিন্তা করিয়া দেখিলে ইহার দ্বারা বুঝা যায় যে, গুরু ব্যতীত কাহারও জীবনে বিকাশ বা উন্নয়ন সম্ভব নয়।

এখন যদি আমরা অতীতের দিকে তাকাই, তাহা হইলে দেখি, জীবনে যাঁহারা সব দিক জয়ী এবং জনগণের নিকট মহাপুরুষ অর্থাৎ মহাপরিপূরণকারী নামে পূজিত ও নমস্য, তাঁহারা সকলেই জীবনে গুরুর প্রয়োজনীয়তা-সম্বন্ধে একই রকম উক্তি করিয়া গিয়াছেন। নিম্নে ঐ সকল বাণীর কয়েকটি উদ্ধৃত করা গেল :—

গীতায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যঃ মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচ। গীতা ১৮-৬৬

অর্থাৎ সর্ব্ব-ধর্ম্ম ছাড়িয়া দিয়া আমার শরণাপন্ন হও—আমি তোমাকে সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত করিব।

শ্রীবুদ্ধ তারস্বরে এই একই উক্তি করিয়া গিয়াছেন :—

বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি।
ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি।
সংঘং শরণং গচ্ছামি।

আবার কোরাণে ঐ একই উক্তি দেখা যায়। যথা :—

"পয়গম্বরকে বাদ দিয়া খোদাকে জানা যায় না"

বাইবেলে দেখা যায়, যীশুখৃষ্ট ঐ একই বাণীর পুনরুক্তি করিয়াছেন, যথা :—

"I am the way. the truth, the light. none can come to the Father but through me." —Bible.

("আমিই পথ, আমিই সত্য, আমিই জীবন—আমার মধ্য দিয়া ছাড়া কেইই পিতার নিকট আসিতে পারে না।")

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গীতায় আরও বলেছেন :—

নাস্তি বুদ্ধিরযুক্তস্য ন চাযুক্তস্য ভাবনা।
ন চাভাবয়তঃ শান্তিরশান্তস্য কুতঃ সুখম্॥

—গীতা ২।৬৬

অর্থাৎ যে কোন আদর্শে (ব্রহ্মজ্ঞ গুরুতে) যুক্ত নয়, তার বুদ্ধিও নাই, ভাবনাও নাই—আর যার ভাবনা নাই, তার শান্তি নাই —আর যার বুদ্ধি ও ভাবনা নাই তার সুখ-শান্তি কোথায় ?

জগৎবরেণ্য স্বামী বিবেকানন্দ গুরুগ্রহণের আবশ্যকতা-সম্বন্ধে বিশেষ দৃঢ়তার সহিত বলিয়া গিয়াছেন, যথা :—

"To carry out the commands of the Guru withont the least shadow of doubt or hesitation is the secret of success in life and there is no other way to follow."

অর্থাৎ নির্ব্বিচারে ও নিঃসন্দেহে গুরুর আদেশ পালন করা জীবনে জয়ী হইবার একমাত্র পথ—ইহা ছাড়া অন্য কোন পথ নাই।

মহারাষ্ট্র-সম্প্রদায়ের গ্রন্থাদি আলোচনা করিলে দেখা যায়, তথায়ও ধর্ম্মনায়কগণ ঐ একই সুরে সুর মিলাইয়া একই উক্তি করিয়াছেন। যথা :—

"The aspirants must be initiated into the mysteries of spiritual life only by a master who has realized God. It is only a burning lamp that can light other lamps. Initiation forms the first step in spiritual life. Nor is God to be realized by strenuous independent thinking or by mastering various sciences. Enlightment is impossible without a Guru."

—Maharashtra Saints and their Teachings.

অর্থাৎ যাহারা ইচ্ছুক তাহারা আধ্যাত্মিক জীবনে একমাত্র ব্রহ্মজ্ঞানীর দ্বারাই দীক্ষিত হইবে। ইহা কেবল একটা জ্বলন্ত প্রদীপের মত যাহা অন্য প্রদীপকে প্রজ্বলিত করিতে পারে। দীক্ষা আধ্যাত্মিক জীবনের প্রথম সোপান। বিজ্ঞানকে অধিগত করিয়া বা অবিরাম চিন্তার দ্বারা ভগবানকে অনুভব করা যায় না। গুরু ব্যতীত মানুষের বিকাশ অসম্ভব।

সর্ব্বজন পরিচিত মহাপুরুষ নানকও ঐ একই সুরে সুর মিলাইয়া ঐ একই বাণী দিয়াছেন। যথা :—

"There can be no love of God without active service. We can not get to heaven by more talk. We must practise righteousness. When God sends

grace to a man, he begins to obey the calls of Guru. Hear ye all, this is the Way to cure disease."

—Guru Nanak.

অর্থাৎ বাস্তব কর্ম্ম ব্যতিরেকে ভগবানের প্রতি প্রেম জন্মায় না। কেবলমাত্র বলার ভিতর দিয়া আমরা স্বর্গলাভ করিতে পারি না। আমাদের ভগবৎ-আরাধনা করিতেই হইবে। ভগবান মানুষকে তখনই দয়া করেন যখন মানুষ গুরুর আদেশ পালন করিতে অভ্যাস করে। ইহাই একমাত্র রোগ নিবারণের পথ।

মহামানব কবীর সাহেবও জীবনে মনুষ্যত্বলাভ গুরু ভিন্ন যে সম্পূর্ণ অসম্ভব তাহাই বলিয়া গিয়াছেন। যথা :—

সব ঘটমে হরি হায় গিরি যুতমে জোতি।
সদ্‌গুরু চমকি বিনা কৈসা প্রকট হোতি॥

অর্থাৎ সব ঘটেই অর্থাৎ দেহেই হরি আছেন—সব পাথরেই আগুন আছে—কিন্তু চকমকি পাথর ছাড়া যেমন পাথরের আগুন হয় না, তদ্রূপ সদ্‌গুরুতে যুক্ত হওয়া ও তাঁহাকে অনুসরণ করা ছাড়া দেহের হরি অর্থাৎ ভগবান দেহে প্রকাশ হন না।

পাশ্চাত্য মনীষিগণ জীবনে গুরুর প্রয়োজনীয়তা-সম্বন্ধে বিশেষভাবে বলিয়াছেন। যথা :—

"Every life has its actual blanks which the ideal must fill up or which else remain bare aud profitless for ever."

—J. W. Hore.

অর্থাৎ প্রত্যেক জীবনের ত্রুটি-বিচ্যুতি আছে যাহা একমাত্র আদর্শ দ্বারাই পরিপূরণ হইতে পারে, নতুবা সারাজীবন নিরসভাবে বৃথা অতিবাহিত হইবে।

"Worship the Great, stick at no humiliation; be the limb of their body, the breath of their mouth, compromise thy egotism."

—'Use of Greatman'—Ralp Waldo Emerson.

অর্থাৎ মহাপুরুষদের অস্তিত্বই তোমার অস্তিত্ব এইরূপ মনে করিয়া অমানী হইয়া তাঁহাদের অর্চ্চনা কর। নিজের অহংকে পাত্‌লা কর।

—এমার্সন।

এখন দেখা যাইতেছে, সকল সম্প্রদায়ের প্রফেট, অবতার ও মনীষিগণ, যাঁহারা প্রজ্ঞায়, প্রেমে, চরিত্রে ও দূরদৃষ্টিবলে আমাদের সকলের নিকট নমস্য, তাঁহারা সকলেই বজ্রগম্ভীর স্বরে ইহাই ঘোষণা করিতেছেন যে, জীবন্ত আদর্শ বা গুরু ব্যতীত মানুষ আদর্শজীবন লাভ করিতে পারে না—মানুষের মনুষ্যত্বের বিকাশ হইতে পারে না। গুরুর আদেশ নিঃসন্দেহে ও নির্ব্বিচারে পালন করাই মানুষের জীবনে জয়ী হইবার একমাত্র পথ, আর দ্বিতীয় কোন পথ নাই। তারপর আরও দেখা যাইতেছে, মনোযোগের সহিত মনে মনে বীজমন্ত্র বা নাম জপের ফলে আমাদের স্নায়ুর উপর ক্রিয়া করিয়া মস্তিষ্কের কোষগুলিকে উত্তেজিত করিয়া তোলে, সেগুলি পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর সাড়াপ্রবণ হয়, মুদ্রিত মস্তিষ্ক-কোষগুলি ফুটিয়া উঠে, যাহা পূর্ব্বে বুঝা কঠিন হইত তাহা তখন সহজেই বুঝা যায়, বুদ্ধি বিকশিত হয়, জ্ঞানের দরজার চাবি খুলিয়া যায়। এই অমূল্য সম্পদ্ মানুষ লাভ করিতে পারে দীক্ষাগ্রহণ অর্থাৎ গুরুগ্রহণ করার ভিতর দিয়া। তাহা হইলে প্রতিটি মানুষের জীবনে

গুরু গ্রহণের বিশেষ প্রয়োজন আছে, তাহা যে-কোন ব্যক্তি ইহা দ্বারা সহজেই উপলব্ধি করিতে পারেন।

আবার দেহ, মন ও আত্মার উৎকর্ষ লাভ করিতে পারিলে মানুষ মনুষ্যত্ব লাভের অধিকারী হইতে পারে। মানুষের যখন ক্ষুধা লাগে তখন মানুষ আহার করিয়া সুস্থ হয়। আত্মার চঞ্চল অবস্থাকে মন বলে। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য এই ষড়রিপু প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই আছে। মন হইল এই ষড়রিপুর ক্রীড়াভূমি। এই মনের খোরাক মানুষ বৃত্তির তৃপ্তিপ্রদ আমোদপ্রমোদের ভিতর দিয়াই আহরণ করে, তাহাতে মানুষের মনুষ্যত্ব অক্ষুণ্ণ না থাকিয়া বিশেষভাবে ক্ষুণ্ণ হইয়াই থাকে। সদ্‌গুরু-প্রদত্ত সৎনামই একমাত্র আত্মার খোরাক। আত্মা অতি সূক্ষ্ম, তথায় নামের কম্পন ব্যতীত আর কিছুই পৌঁছান সম্ভব নয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র বলেন—

"ভারতের অবনতি (degeneration) তখন থেকেই আরম্ভ হ'য়েছে যখন থেকে ভারতবাসীর কাছে অমূর্ত্ত ভগবান্ অসীম হ'য়ে উঠেছে—ঋষি বাদ দিয়ে ঋষিবাদের উপাসনা আরম্ভ হ'য়েছে।

ভারত! যদি ভবিষ্যৎ কল্যাণকে আবাহন করতে চাও তবে সম্প্রদায়গত বিরোধ ভুলে, জগতের পূর্ব্ব পূর্ব্ব গুরুদের প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন হও—আর তোমার মূর্ত্ত ও জীবন্ত গুরু বা ভগবানে আসক্ত (attached) হও—তাদেরই স্বীকার কর, যারা তাকে ভালবাসে, কারণ পূর্ব্ববর্ত্তীকে অধিকার করিয়াই পরবর্ত্তীর আবির্ভাব।"

—সত্যানুসরণ, শ্রীশ্রীঠাকুর।

ঋষি বাদ দিয়া চলিবার ফলে আজ আমরা চরিত্র, পরমায়ু, স্বাস্থ্য, জ্ঞান ও সংহতি সকলই হারাইয়াছি। যে কারণে ভারত দ্বিখণ্ডিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে বাকী যাহা কিছু ছিল সবই ভূসম্পত্তি, অর্থ, মায়ের সতীত্ব, জীবন ও জাতি-মান—চোর, দস্যু ও গুণ্ডার হাতে হারাইতে বাধ্য হইয়াছি, সম্বলের মধ্যে আছে শুধু না জানার অহঙ্কার, আর নেতা হইবার থড়বড়ানি। আজ সর্ব্বহারা হইয়া একমুষ্টি অন্নের জন্য, একখণ্ড বস্ত্রের জন্য, মাথা গুঁজিবার একটু স্থানের জন্য দ্বারে দ্বারে ক্রন্দন করিয়া ঘুরিতেছি। এখনও কি জাগরণ আসিবে না, এখনও কি আমাদের ঘুম ভাঙ্গিবে না? কেন, কি কারণে এই দুর্দ্দশা আমাদের? ইহার নিরাকরণের জন্য অহঙ্কারকে পাতলা করিয়া মহাপুরুষদের কথায় কর্ণপাত করিবার সময় আসে নাই কি এখনও?

মানুষ সাধারণতঃ বৃত্তির অধীন, রিপুর অধীন। যতক্ষণ কোন মানুষ রিপুর অধীন থাকে ততক্ষণ সেই মানুষ রিপুর দ্বারা চালিত হয়, তখন মানুষ তাহার মনুষ্যত্বকে হারাইয়া ফেলে, সে আর কাহারও নিকট তখন নির্ভরযোগ্য বা বিশ্বাসী হইতে পারে না, সত্যিকার সমাজের বা দেশের সেবক হইতে পারে না। আজ দেশে এমন একটি লোক সন্ধান করিয়া পাওয়া যায় না যাহাকে অর্থ ও স্ত্রীলোক দিয়া নির্ভর করা যায় বা বিশ্বাস করা যায়। একমাত্র যিনি জিতেন্দ্রিয় বা নিয়ন্ত্রিত, তিনিই নির্ভর-যোগ্য আর তিনিই সত্যিকার সমাজের, দেশের বা দশের সেবক হইতে পারেন। আর এই নিয়ন্ত্রিত দেশ-সেবকগণের

মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সেবক যিনি, তিনিই হইবেন দেশের শ্রেষ্ঠ নেতা, তাই বাইবেলে আছে—"The greatest servent is the greatest leader." এখন এই নির্ভরযোগ্য স্বভাব-চরিত্র লাভ করিতে হইলে চাই মানুষের জীবনে একজন জীবন্ত আত্মজয়ী বা ইন্দ্রিয়জয়ী পুরুষ—ইষ্ট বা আদর্শ ; এবং তাঁহার প্রতি বৃত্তি-ভেদী টান বা অনুরাগের সহিত তাঁহার নির্দ্দেশানুযায়ী জীবনে চলা। এই ইন্দ্রিয়জয়ী পুরুষই হইলেন ইষ্ট বা গুরু বা আদর্শ বা মানুষের জীবন-রথের সারথি।

জিতেন্দ্রিয় বা ইন্দ্রিয়জয়ী হওয়া মানে, ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ নয় বা ইন্দ্রিয়কে বিনষ্ট করা নয়। ইন্দ্রিয়ের অধীন যখন কোন মানুষ থাকে তখন সে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা চালিত হয়। আবার ইন্দ্রিয় যখন কোন মানুষের অধীন হয় তখন ইন্দ্রিয় আবার চালিত হয় মানুষের দ্বারা, তখন আর ইন্দ্রিয় দ্বারা ঐ মানুষ চালিত হয় না, তখন ঐ মানুষটিকে বলে জিতেন্দ্রিয় বা ইন্দ্রিয়জয়ী।

দেখা যায়, মানুষ তাহার জীবনে যাহাকে ভালবাসে তাহার রঙ্গে রঙ্গীণ হয় অর্থাৎ তাহার ন্যায় চরিত্র ও আচরণ লাভ করে। মনীষী গোটে বলিয়াছেন—"We are shaped and fashioned by what we love." —Goethe

অর্থাৎ আমরা যাকে ভালবাসি তাহার রঙ্গে রঙ্গীণ হই।

মানুষের প্রতি মানুষের সত্যিকারের প্রীতি বা ভালবাসা জন্মায় কিরূপে এ সম্বন্ধে শাস্ত্রে আছে, যথা :—

দদাতি প্রতিগৃহ্ণাতি গুহ্যমাখ্যাতি পৃচ্ছতি।
ভুংক্তে ভোজয়তে চৈব ষড়বিধং প্রীতিলক্ষণম্॥

অর্থাৎ দেওয়া, নেওয়া, গোপন কথা বলা ও জিজ্ঞাসা করা, খাওয়া ও খাওয়ান এই ছয়টি হইতেছে প্রীতি-লক্ষণ। ইহাতে পরস্পরের প্রতি প্রীতি বর্দ্ধিত হয়। করা ও বলা নাই, আচরণ নাই, অনুষ্ঠান নাই, শুধু ভাবা আছে এমনতর অনুরাগ কিছুতেই বাস্তব হইয়া উঠিতে পারে না। তাই সত্যিকার বিধান—"আচারঃ পরমো ধর্ম্মঃ।"

তাই জিতেন্দ্রিয় বা ইন্দ্রিয়জয়ী হইতে হইলে সৎকথা বা নীতি-কথা মুখস্থ করিয়া হওয়া যায় না। ইন্দ্রিয়জয়ী—আত্ম-জয়ী জীবন্ত মহাপুরুষকে যিনি আদর্শ বা গুরুরূপে বরণ করিয়া তাঁহার আদেশ ও নির্দ্দেশ নির্ব্বিচারে মানিয়া চলিতে অভ্যাস করেন, তাহার বৃত্তিগুলি ইষ্টে নিয়ন্ত্রিত করেন—ইষ্টস্বার্থ ও প্রতিষ্ঠায় নিজেকে বিকিয়ে দেন, তিনিই ইন্দ্রিয়জয়ী হইতে পারেন। এ সম্বন্ধে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিয়াছেন—

"ঈশ্বরে একবার অনুরাগ হ'লে কাম-ক্রোধাদি থাকে না। গোপীদের এই অবস্থা হয়েছিল। কৃষ্ণে অনুরাগ, ভক্তিপথে অন্তরেন্দ্রিয়-নিগ্রহ আপনি হয়—আর সহজে হয়, ঈশ্বরের উপর যত ভালবাসা আসবে—ততই ইন্দ্রিয়সুখ আলুনী লাগবে।"

—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত ২য় ভাগ—৩১ পৃঃ

আবার এই যে ষড়রিপুগুলি যদি মানুষের না থাকে তাহা হইলে মানুষের অস্তিত্বই থাকে না—মানুষ জড় পদার্থের ন্যায় হইয়া যায়, কারণ এই রিপুগুলি আছে বলিয়াই জীবনের গতি আছে। ভগবান্ রিপুগুলি সদ্‌ব্যবহার করিবার জন্য দিয়েছেন। মানুষ যখন ইষ্টানুগ চলনার ভিতর দিয়া ইন্দ্রিয়গুলিকে অধীনে

আনিয়া তাঁরই কাজে নিয়োজিত করে, তখন মানুষ সত্যিকার মনুষ্যপদবাচ্য হয়। সকলে তখন তাহাকে দেবতা বলিয়া শ্রদ্ধা করে। রিপু তাহার অধীশ্বরের মঙ্গলামঙ্গলের দিকে না তাকাইয়া তাহার চাহিদা পূরণ করিবার জন্য সর্ব্বদাই উন্মত্ত থাকে, অনেকে এই রিপুগুলিকে দমন করিবার চেষ্টা করেন, কিন্তু চিকিৎসা-শাস্ত্রের বিশেষজ্ঞগণ বলেন "অধিকাংশ সময় এগুলিকে দমন করিবার চেষ্টার ফলে নানা রকম উৎকট ব্যাধির সৃষ্টি হয়।" আর এই রিপুগুলিকে সাময়িকভাবে দমন করিতে সমর্থ হইলেও ভবিষ্যতে ইহার ফল সাধারণতঃ খারাপ হয়। দেখা যায় কাম-রিপুকে মানুষ কোনরূপ কসরৎ দ্বারা সাময়িকভাবে দমন করিলেও যখন বাঁধ ভাঙ্গার মত একদিন খুলিয়া যায় তখন কামের তাড়নায় তাহার কল্পনাতীত এমন কোন কুকর্ম্ম করিয়া বসে যে তাহার জন্য সে তখন নিজেই লজ্জিত হয়। সুতরাং ইন্দ্রিয় জয় করিবার অর্থাৎ ইন্দ্রিয়কে অধীন করিবার শাশ্বত পথই হইল জীবন্ত সদ্‌গুরু বা ঋষিকে শ্রীগুরুপদে বরণ করিয়া তাঁহাকে আপ্রাণভাবে ভালবাসা, ব্যক্তিগত জীবনে তাঁর নির্দ্দেশগুলি নির্বিবচারে মানিয়া চলা। ইহা ছাড়া অন্য পথ নাই। তাই শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র বলিয়াছেন—

ইষ্ট নাই নেতা যেই
যমের দালাল কিন্তু সেই।

অর্থাৎ অনিয়ন্ত্রিত জীবনে নেতা হওয়া—আর যমের দালাল হইয়া জন ও জাতির মৃত্যুর কারণ হওয়া একই কথা ; কারণ বৃত্তি

বা রিপু নিয়ন্ত্রিত হইবে যাহাকে ধরিয়া সেই জীবন্ত ইষ্ট বা আদর্শ তাহার নাই। এ সম্বন্ধে একজন পাশ্চাত্য মনীষী বলিয়াছেন—

"The worst of slaves is he whom passion rules." —Henry Brooks.

অর্থাৎ যিনি রিপুর দ্বারা শাসিত তিনি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরাধীন।

কিন্তু বহুকালের ঋষিচ্যুত জাতি আমরা, আমাদের আজ কাহারও সেদিকে লক্ষ্য নাই। নাজানার অহঙ্কারই আজ আমাদের লক্ষ্যভ্রষ্ট করিয়া জাহান্নামের পথে ঘাড় ধরিয়া লইয়া চলিয়াছে। কিন্তু কে রোধ করিবে সেই পথ? কোথায় আজ পূজ্যপাদ ঋষি শাণ্ডিল্য, মহর্ষি বশিষ্ঠ, কোথায় আজ চির নমস্য ঋষি সাবর্ণ, ঋষি ভরদ্বাজ? কোথায় আজ বিরাট ঋষি কাশ্যপ? আজ প্রত্যেকের জীবনরথ সারথী-বিহীন। তাহার ফল যাহা হইবার তাহা হইয়াছে। তথাপি আজ আমাদের জাগরণ আসে না।

এতদূর বিস্তারিত আলোচনার পরও তথাকথিত শিক্ষিত ব্যক্তিগণের মধ্যে দুই-একজনকে বলিতে শুনা যায়, পিতামাতাই আমাদের একমাত্র গুরু—তাহাদিগকে প্রীত করিতে পারিলেই আমাদের সব হইবে, অন্য কোন গুরুর প্রয়োজন নাই। তাহারা একবার ভাবিয়া দেখুন, যদি তাহাই হইবে তাহা হইলে পূজ্যপাদ ঋষিগণ "পিতৃদেবো ভব", "মাতৃদেবো ভব" এই কথা বলিয়াই শেষ করিতেন, "আচার্য্য দেবো ভব" এই কথা আর বলিতেন না। মাতাপিতা প্রত্যক্ষ দেবতা এ কথা অতি নিশ্চিত।

তাঁহাদিগকে নিশ্চয়ই ভক্তি করিতে হইবে, তাঁহারা প্রীত হইলে, তাঁহারা তৃপ্ত হইলে তবে ভগবান্ প্রীত হন—তৃপ্ত হন, ইহা অতি সত্য কথা। কিন্তু ইহাও অতীব সত্য যে পিতামাতা ব্রহ্মজ্ঞ না হইলে ব্রহ্মজ্ঞ গুরু ব্যতীত ব্রহ্মকে—ভগবানকে জানা যায় না, গুরুকে—আচার্য্যকে বাদ দিয়া শুধু পিতামাতার সেবা-অর্চ্চনা দ্বারা ভগবানকে জানা যায় না, ইহা ছাড়া যিনি গুরুকে গ্রহণ করিয়া তাঁহার প্রতি বৃত্তিভেদী টান বা অনুরাগের ভিতর দিয়া নিয়ন্ত্রিত হন নাই তিনি রিপুর অধীন—বৃত্তির অধীন, তিনি কিরূপে পিতামাতাকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ভক্তি করিবেন ও পিতামাতার সেবা-অর্চ্চনা করিবেন? অনিয়ন্ত্রিত যিনি তিনি কামের অধীন অর্থাৎ স্ত্রীর অধীন হইয়াই আছেন। এ সম্বন্ধে কবীর সাহেবের সুন্দর একটি দোঁহা আছে, যথা :—

"জগ্‌মে ভক্ত কঁহা ওই, চুল ট চুন নাহি দেয়,
শিষ জরুকা হো রহা—নাম গুরুকা লেয়॥

—কবীর।

অর্থাৎ জগতে ভক্ত দেখা যায় না প্রায়ই—একটু পানে চুন চাইলে তাই দিতে চায় না। মানুষ মুখ্যতঃ স্ত্রীরই শিষ্য হয়ে আছে—যদিও মুখে-মুখে গুরুরই নাম নেয়।

সুতরাং ভাবিতে গেলে বেশ বুঝা যায়, বহুদর্শী ঋষিগণ "পিতৃদেবো ভব", "মাতৃদেবো ভব" বলিয়া ক্ষান্ত হন নাই কেন এবং পুনরায় "আচার্য্যদেবো ভব" কথাটি কেন বলিয়াছেন। সত্যিকার গুরুভক্তিপরায়ণ সন্তানই পিতামাতাকে বাস্তবভাবে প্রীত ও তৃপ্ত করিতে পারে। যে সত্যিকার গুরুভক্তিপরায়ণ

হয় নাই সে কিরূপে পিতামাতার প্রতি ভক্তিপরায়ণ হইবে? তাহা কি কখনও সম্ভব? আমি এ-সম্বন্ধে শ্রীশ্রীঠাকুরকে কতবার বলিতে শুনিয়াছি—

"মাতাপিতার প্রতি যাহার আন্তরিক ভক্তি থাকে সে জগতে একটা বড় হবেই, তারপর আবার তার যদি তদ্রূপ গুরুভক্তি থাকে তাহ'লে যে কত বড় হবে তাহা কল্পনা করা যায় না।"

অতএব জীবনে মানুষের গুরু ও মাতাপিতা সকলেরই প্রয়োজন আছে।

গুরু

এখন গুরু বলিতে আমরা কি বুঝি এ-সম্বন্ধে শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র বলিয়াছেন—

"যাহা যাহা লইয়া ভগবান্ তাহাই ভগবত্তা, আর এই ভগবত্তার আরাধনায় যিনি সেগুলি চরিত্রগত করিয়াছেন—যাঁহার ভাবা, বলায়, চলায় ও করায় সেগুলি প্রকট হয় তিনিই গুরু—তাঁতেই ভগবত্তা আছে, তাই "ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্ম এব ভবতি" অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞ যিনি তিনিই ব্রহ্ম। আর এই মূর্ত্ত গুরুরূপী ভগবান্ ছাড়া আমাদের উন্নয়নের অন্য কোন পথ সম্ভব কিনা জানি না। যীশু বলেছেন, "আমিই পথ, আমিই সত্য, আমিই জীবন—আমার মধ্য দিয়া ছাড়া কেহই পিতার নিকট আসিতে পারে না"—তার মানে কি? এই কি নয়? তাই যার আদর্শ (গুরু) নাই, মূর্ত্ত আদর্শ নাই—আর তাতে প্রেম-ভক্তি বা আসক্তি বলে কিছু নেই, যিনি কাউকে actively fulfil (বাস্তবে পরিপূরণ) ক'রে নিজেকে সার্থক করেননি, তিনি কি-করে গুরু হ'তে পারেন?

চৈতন্যচরিতামৃতেও আছে, যিনি তত্ত্বজ্ঞ তিনিই গুরু, যথা :—

কিবা ন্যাসী, কিবা যোগী, শূদ্র কেন নয়।
সেই কৃষ্ণ তত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয়॥ —চৈ : চ :।

গীতাতেও আছে যে তত্ত্বজ্ঞ অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞ গুরুর নিকট জ্ঞান শিক্ষা করিবে, যথা :—

তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিন :॥

—গীতা ৪।৩৫

অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞ গুরুর নিকট প্রণাম, প্রশ্ন ও সেবাদ্বারা জ্ঞানশিক্ষা করিবে। আমাদের মধ্যে যাহারা গুরুবাদ মানেন তাহারাও গুরু তত্ত্বজ্ঞ কিনা সেদিকে দৃষ্টি করেন না।

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র এ-সম্বন্ধে অতি সহজ ও সুন্দর ভাবে বলিয়াছেন—

"বস্তুহারা গুণ যেমন
ভাবতে পারা যায় না।
ব্রহ্মবিদ্ বিনে তেমনি
ব্রহ্ম পাওয়া যায় না।"

অর্থাৎ গুণ কখনও গুণীকে না দেখিলে মানুষ বুঝিতে পারে না। সুন্দর বস্তু না দেখিয়া সৌন্দর্য্যকে কল্পনা, দয়ালু ব্যক্তিকে না দেখিয়া দয়ার বোধ, ক্রোধীকে না দেখিয়া ক্রোধের বোধ যেমন অসম্ভব, তেমনি যাঁহার চরিত্রে ব্রহ্ম মূর্ত্ত

হইয়া উঠিয়াছেন, যিনি ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া ব্রহ্মস্বরূপ হইয়াছেন—সেই ব্রহ্মবিদ্ পুরুষকে শ্রীগুরুপদে বরণ ও অনুসরণ না করিয়া ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করাও সম্পূর্ণ অসম্ভব।

গুরু বা Guide (পরিচালক) আবার কি ? এই গুরু Guide বা চালক নিয়েই তো যত সব দ্বন্দ্বের সৃষ্টি ; এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র বলিয়াছেন :—

"অস্তিত্ব এবং উন্নয়নের বিধি যাঁহাদের ভিতর প্রকট হইয়াছে বা হইয়াছিল, তাঁহারাই গুরু, Guide বা চালক—তাই সব গুরু একই, —আর যাহা হইতে যে directly (সম্যকরূপে) ইহা পায়, তিনি তাঁর আদর্শ, গুরু বা Guide (চালক)। তিনি অনুসরণীয়, আর আর অন্যান্য যাহারা—তাহার ভক্তির পাত্র—পূজার পাত্র—তাহাদের জীবন-কর্ম্মের আলোচনায় আমরা আদর্শে অটুট হই, —তাই উন্নতি আমাদের কাছে অবাধ হইয়া আসে।"

হনুমান নাকি বলিয়াছেন,—

শ্রীনাথে জানকীনাথে অভেদ পরমাত্মনি।
তথাপি মম সর্ব্বস্বঃ রামঃ কমললোচনঃ ॥

গুরুতে যেখানে দ্বন্দ্ব, সেখানে গুরুত্বের অপলাপ নিশ্চয়ই—আর সে হিন্দুই হোক, মুসলমানই হোক, খৃষ্টানই হোক, বৌদ্ধই হোক। যাহার সংসর্গে গুরুভক্তির অপলাপ ঘটে, সে-সংসর্গ সর্ব্বদা পরিত্যাজ্য, কারণ তাহা অবনতিকে আমন্ত্রণ করে। সে-সংসর্গে গুরুত্ব নাই, বরং আরও উল্টো আছে। যেখানে গুরুত্ব আছে, সেখানেই নিজের আদর্শ, গুরু বা Guide (চালক)-এর বিভিন্ন মূর্ত্তি, বিভিন্ন রূপ কল্পনা করিয়া তাঁদের সেবাভক্তি করাই সমীচীন—যদি তাহা হইতে আমাদের এমনতর ভাব না আসে, যাহা দ্বারা আমরা আদর্শ হইতে বিচ্যুত বা পতিত হই।

"অন্য গুরুতে অশ্রদ্ধাবান্ না হইয়া যদি কেহ আপন গুরুতে নিষ্ঠা ও ভক্তিপরায়ণ হয়, তার প্রতি প্রকৃত সমস্ত গুরুই সন্তুষ্ট থাকেন, তাই বুঝি 'সর্বদেবময়ো গুরুঃ' কথার সৃষ্টি।"—'নানাপ্রসঙ্গে' ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৭

ভগবান্ সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দের বাণী :—

"এক নির্গুণ ব্রহ্ম বেশ বুঝিতে পারি, আর তাহারই ব্যক্তি-বিশেষে বিশেষ বিশেষ প্রকাশ দেখিতে পাইতেছি, এই সকল ব্যক্তি-বিশেষের নাম ঈশ্বর যদি হয় তা বেশ বুঝিতে পারি—তদ্ভিন্ন কাল্পনিক জগৎকর্তা ইত্যাদি হাস্যকর প্রবন্ধে আমার বুদ্ধি যায় না।"

—স্বামী বিবেকানন্দ।

জীবন্ত গুরু

আবার দেখা যায়, যাঁহারা সিদ্ধগুরু বা সদ্‌গুরুর প্রয়োজন আছে স্বীকার করেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকে আবার প্রশ্ন করেন, গুরু আবার জীবন্ত লাগিবে কেন? অতীত বা মৃত সদ্‌গুরু বা সিদ্ধগুরুকে অনুসরণ করিলেই তো চলিতে পারে! জাগতিক বিদ্যালাভের বেলায় আমাদের শিক্ষকের প্রয়োজন আছে ইহা সকলেই স্বীকার করি;—সেখানে মৃত বা অতীত শিক্ষক দ্বারা কেন চলিবে না একথা বলিলে সকলেই উপহাস মনে করিবেন—এ বিষয়টী এত সহজে সকলে বুঝিতে পারেন কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে গেলে গুরুর প্রয়োজন মানে যে জীবন্ত সদ্‌গুরু বা ব্রহ্মজ্ঞ গুরুর প্রয়োজন—এ বিষয়টী যেন সকলের পক্ষে বুঝা বড়ই কঠিন হইয়া পড়ে।

এ সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন—

"হে মানব! মৃতের পূজা হইতে আমরা তোমাদিগকে জীবন্তের পূজায় আহ্বান করিতেছি। গতানুশোচনা হইতে বর্ত্তমান পর্যান্ত আহ্বান করিতেছি। বুদ্ধিমান বুঝিয়া লও।"—

—বিবেকানন্দ।

মৃতের পূজা-প্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দ আরও বলিয়াছেন ঃ—

'Old forms of religion are like the skeletons of once mighty animals preserved in museums. They should be regarded with due honour. They cannot satisfy the true cravings of the soul for the Highest, just as a dead mango-tree cannot satisfy the craving of a man for a bunch of luscious mangoes.'

—Vivekananda

"অর্থাৎ ধর্ম্মের এই পুরাতন রূপ হইল মিউজিয়ামে রক্ষিত শক্তিশালী জীবজন্তুর কঙ্কালের মত। তাহাদের যথাযোগ্যভাবে শ্রদ্ধাকরা উচিত। মিউজিয়মে রক্ষিত শক্তিশালী জীবজন্তুর কঙ্কালগুলি পরমাত্মা লাভের আত্মার সত্যিকার আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তি সাধন করিতে পারেনা, ঠিক যেমন একটী মৃত আম্রবৃক্ষ একছড়া সুস্বাদু আম্রের আকাঙ্ক্ষিত ব্যক্তির আকাঙ্ক্ষা তৃপ্ত করিতে পারে না।"

প্রেরিত বর্ত্তমান ও পূর্ব্বতন সম্বন্ধে শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র বলিয়াছেন—

(১)

বুদ্ধিধর্ম্ম দোহাই দিয়ে কত রং-চং লাগিয়ে গায়।
বর্ত্তমানে প্রেরিত যিনি, পড়্‌লি নাকো তাঁরি পায়॥
হচ্ছিস্ সাবাড়, কচ্ছিস্ কাবার, পয়মালেতে যাচ্ছিস কত।
এখনও ফের জীবনের জের, ভাঙ্গিস্ নারে হ'স্ না হত॥"

(২)

"বুদ্ধ ঈশায় বিভেদ করিস্ শ্রীচৈতন্য, রসুল, কৃষ্ণে,
জীবোদ্ধারে আবির্ভাব হন, একই ওঁরা, তাও জানিসনে॥"

আমাদের মধ্যে যাঁহারা গুরুর প্রয়োজন বোধ করেন তাঁহারাও দেখা যায় গুরু সম্বন্ধে নানারূপ বিকৃত বা ভ্রান্ত-ধারণা লইয়া চলিতেছেন। এ-সম্বন্ধে শাস্ত্রে কি আছে এবং পূর্ব্ব পূর্ব্ব মহাপুরুষগণ কি বলিয়াছেন তাহা সম্যক্‌ভাবে জানিয়া যথাবিহিতভাবে গুরুকরণ বা গুরুগ্রহণের প্রয়োজন বোধ করেন না। এই-জাতীয় গোঁড়ামিই আমাদে সর্ব্বনাশের বা অধঃপতনের মুখ্য কারণ। পূর্ব্ব পূর্ব্ব মহাপুরুগণের প্রতিমূর্ত্তি আমাদের গৃহেই পুষ্পমাল্যে সুশোভিত অবস্থায় রক্ষিত হইয়া থাকে, কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই যে আমরা তাঁহাদের কাহারও বাণীর সহিত পরিচিত নই এবং পরিচিত হইবার প্রয়োজনও বোধ করি না।

কুলগুরু

আমাদের দেশে কুলগুরু-প্রথা প্রচলিত আছে। বংশাবলী গুরুকে কুলগুরু বলা হয়। এই কুলগুরু তত্ত্বজ্ঞ বা ব্রহ্মজ্ঞ

(দ্রষ্টা) না হইলেও তাঁহার নিকট দীক্ষা লইবার ব্যবস্থা সমাজে প্রচলিত আছে, দেখা যায়। তাঁহার নিকট দীক্ষা না লইলে আমাদের ধারণা বা বিশ্বাস যে মহাপরাধ বা মহাপাপ হয়।

গুরু ব্রহ্মজ্ঞ না হইলেও আমাদের ধারণা যে, ভক্তি, বিশ্বাস থাকিলে গুরু যেরূপই হউন না কেন, তাঁহার নিকট ব্রহ্মজ্ঞান, ভগবদ্‌জ্ঞান লাভ করা সম্ভব, কিন্তু ইহা আমরা বিবেচনা করিয়া দেখি না যে, যাহার ভিতর যে গুণ বা যে জ্ঞান নাই, তাহাকে যতই বিশ্বাস-ভক্তি করি না কেন, তাহার নিকট হইতে সে গুণ বা জ্ঞান প্রাপ্তি কখনও সম্ভব নয়। মনে করুন, একজন অশিক্ষিত ব্যক্তিকে শিক্ষিত পণ্ডিত বলিয়া বিশ্বাস করিয়া তাহাকে ভক্তি করেন, তাহার সেবা করেন, তাহার অনুসরণ করেন, দেহ, মন ও ধন দিয়া তাহাকে ভালবাসেন, তাহা হইলে কি ঐ অশিক্ষিত মূর্খের নিকট আপনার বিদ্যালাভ করা সম্ভব হইবে?

যিনি ব্রহ্মজ্ঞ নন, যাহার ভিতর ভগবত্তার বিকাশ হয় নাই, তাহাতে তদ্রূপ বিশ্বাস আনা কখনই সম্ভব নয়। ভক্তি, বিশ্বাস ছাড়া কিছু হয় না একথা সত্য, তবে যোগ্য পাত্রে বিশ্বাস চাই—অযোগ্য পাত্রে বিশ্বাসে কিছুই লাভ নাই।

তবে এখন কথা হইতেছে যে, কুলগুরু-প্রথা আমাদের দেশে আসিল কোথা হইতে। পুরাকালে ঋষি বা ব্রহ্মজ্ঞ ব্যতীত গুরুকরণ হইত না। মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে দেখা যায় যে

এই ব্রহ্মজ্ঞ গুরুকে বা ঋষিকে কৌলগুরু বলা হইত। দেখা যায়, কালক্রমে ব্রহ্মজ্ঞ গুরু বা ঋষির অভাবে এই শাস্ত্রসম্মত কৌলগুরু প্রথাটা কুলগুরু-প্রথায় পরিণত হইয়াছে।

মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে আছে—

"ন কুলং কুলমিত্যাহু কুলং ব্রহ্ম সনাতনম্।"

অর্থাৎ সনাতন ব্রহ্মই কুল, বংশকে কুল বলে না; সুতরাং এই সনাতন ব্রহ্মকে যিনি জানেন তিনি কৌল অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞ বা ঋষি।

আবার গুরুতন্ত্রে আছে—

কুলীনঃ সর্ব্ব মন্ত্রনামধিকারীতি গীয়তে।
দীক্ষাগুরুঃ স এব স্যাৎ সর্ব্ব মন্ত্রস্য পারগঃ॥

অর্থাৎ কৌল ব্যক্তিই সকল মন্ত্রের অধিকারী এবং তিনিই নিখিল মন্ত্রের পারগ ও দীক্ষাগুরু বলিয়া খ্যাত।

মহানির্ব্বাণতন্ত্রে আরও আছে—

"সিদ্ধ মন্ত্রাঃ সুসিদ্ধিদাঃ"

অর্থাৎ সিদ্ধমন্ত্র মানে, যে মন্ত্র সুসিদ্ধি দান করে। সুতরাং সিদ্ধ পুরুষ-প্রদত্ত মন্ত্রই সিদ্ধমন্ত্র—যিনি সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন—তাহার দ্বারা প্রদত্ত মন্ত্র।

আরো আছে—

মন্ত্রার্থং মন্ত্রচৈতন্যং যো ন জানতি সাধকঃ।
শতলক্ষ প্রজপ্তোঽপি তস্য মন্ত্র ন সিধ্যতি॥

অর্থাৎ যে সাধক মন্ত্রের অর্থ—মন্ত্রের চেতনা জানে না, শতলক্ষ মন্ত্র জপ করিলেও তাহার মন্ত্র সিদ্ধ হয় না।

ইহাদ্বারা সহজেই বুঝা যায় যে, যাহার মন্ত্র সিদ্ধ নয় বা যিনি সিদ্ধপুরুষ নন, তাহার প্রদত্ত মন্ত্র লইলে বা তাহাকে শ্রীগুরুপদে বরণ করিলে কিছুই হইবে না।

এসম্বন্ধে আরও আছে—

"কৌলাৎ ভবতি ব্রহ্মবিৎ"

অর্থাৎ কৌলের নিকট দীক্ষাগ্রহণ করিলে ব্রহ্মজ্ঞ হওয়া যায়। তারপর দীক্ষা কথাটি আসিয়াছে দীক্ষ্ ধাতু হইতে। দীক্ষ্ ধাতু মানে দক্ষতা লাভ করা। দক্ষতা লাভের জন্যই দীক্ষা গ্রহণ আবশ্যক।

শাস্ত্রে আছে—

"ঋষয়ো মন্ত্রদ্রষ্টারঃ।"

অর্থাৎ যাহারা মন্ত্রদ্রষ্টা, তাঁহারা ঋষি। তাই শাস্ত্রে আছে, যিনি মন্ত্রদ্রষ্টা তিনিই মন্ত্র দিতে পারেন। সুতরাং মন্ত্রদ্রষ্টা বা ঋষি ছাড়া কেহই গুরু হইতে পারে না। মন্ত্রদ্রষ্টা বা ঋষি বা কৌল না পাইয়া তথাকথিত কুলগুরুর নিকট হইতে একবার দীক্ষা লইলেও মন্ত্রদ্রষ্টা বা কৌলগুরু অর্থাৎ ঋষি বা ব্রহ্মজ্ঞ গুরু পাইলে তাঁহার নিকট পুনরায় দীক্ষা লওয়া একান্ত কর্তব্য। মন্ত্রদ্রষ্টা বা কৌলগুরুর নিকট দীক্ষিত না হইলে দীক্ষার উদ্দেশ্য সাধিত হয় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র বলেন—

"সিদ্ধ নয় মন্ত্র দেয়
মরে মারে করেই ক্ষয়।"

তন্ত্রসারে আছে—

১। অতো যো জ্ঞান দানেহি ন ক্ষমস্তং ত্যজেৎ গুরুম্।

২। লক্ষমেকং গুরুং ত্যজেৎ।

অর্থাৎ জ্ঞানদান করিতে অক্ষম—এমন গুরুকে ত্যাগ করিবে। ঐপ্রকার লক্ষ গুরুও ত্যাগ করা যায়।

"মননাৎ ত্রায়তে ইতি মন্ত্রঃ"।—কুলার্ণবতন্ত্র ১৭।৫৪

অর্থাৎ যাহা মনন করিলে বা মনে-মনে জপ করিলে ত্রাণ পাওয়া যায় তাহাই মন্ত্র।

আর 'বীজমন্ত্র' কথাটিও একটা হেঁয়ালীর মত আমাদের দেশে প্রচলিত হইয়া আছে। গুরুর প্রতি একানুরক্তি লইয়া মানুষ দীক্ষান্তে নাম-জপ ও ধ্যান-যাজনাদি যখন যথাবিধি করিয়া থাকে, তখন তাহার মস্তিষ্কের কেন্দ্রসমূহ স্বতঃ উত্তেজিত হইয়া বাহিরের আঘাত-জনিত কোন শব্দ না হইলেও অন্তরুত্তেজনায় শব্দ বোধ করিতে থাকে। এই শব্দসমূহ যখন শ্রুত হয়, তখন বোঝা যায়, সাধকের মস্তিষ্ক-কেন্দ্র-সমূহ ক্রিয়াশীল হইয়া উঠিয়াছে। ইহাকে আমরা autostimulation of the auditory centre (মনোবিজ্ঞানের ভাষায় অডিটরি স্নায়ুকেন্দ্রের স্বতঃ উত্তেজনা) বলি। এই শব্দ শ্রবণের এক স্তরপারম্পর্য্য আছে। একাগ্রতার প্রথম স্তরে ঘন্টাশব্দবৎ ক্লীং-জাতীয় শব্দ শ্রুত হয়। এইরূপে একাগ্রতার ক্রম-গভীরতায় স্বতঃই হ্রীং, ওঁ প্রভৃতি নানা শব্দের বোধ হইতে থাকে। একাগ্রতাজনিত ঐ অনুভূত শব্দানুকরণে যে নাম ও মন্ত্রগুলি ঐ একাগ্রতার ও ঐ মানসিক

অবস্থার উদ্দীপনার জন্য দীক্ষা লইয়া আমরা যথাবিহিত জপ করি, তাহাদিগকে বলি বীজমন্ত্র। এই বীজমন্ত্রগুলি ঐ অনুভূত অনাহত নাদেরই বাচনিক প্রতিরূপ,—যাহা বিধি-মাফিক জপ করিলে আমরা একাগ্রতার ঐ উচ্চস্তরে উন্নীত হই (১) তাই শ্রীশ্রীঠাকুর বলেন—'সদ্‌গুরু পেলেই, কাল ও অবস্থা বিবেচনা না ক'রে তৎক্ষণাৎ যে দীক্ষাগ্রহণ না করে—কাল তার পাতকী অঙ্কুশে দিগদারী সর্ব্বনাশে তাকে টানতে কিছুতেই ছাড়বে না।"

(২) যদি ভাগ্যবশে নৈব সিদ্ধ বিদ্যাৎ লভেৎ প্রিয়ে।
তদৈব তান্তদীক্ষেত ত্যক্তাগুরু বিচারনম্॥

বঙ্গানুবাদ :—যদি ভাগ্যবশে সিদ্ধগুরুর সন্ধান পাওয়া যায় তাহা হইলে সমুদয় বিচার ত্যাগ করিয়া তৎক্ষণাৎ দীক্ষা গ্রহণ করিবে।

(৩) "ন তিথি র্ন ব্রতং পূজা ন সন্ধ্যা ন জপক্রিয়া।
দীক্ষায়াং কারণং জ্ঞানং স্বেচ্ছা প্রাপ্তে চ যদ্‌গুরৌ॥"
—যামল বচন।

বঙ্গানুবাদ :—সদ্‌গুরু প্রাপ্ত হইলে তাহার জ্ঞান ও ইচ্ছাই কারণ, অতিথির সংযমাদি, ব্রত, পূজা ও সন্ধ্যার অপেক্ষা করিবে না।

সাধন-তত্ত্ব

মানুষের জীবনের মূলে আছে কতগুলি চাহিদা বা পাইবার আকৃতি বা অভাব। মানুষ আনন্দ লাভ করে তখনই যখন এই অভাব পরিপূরণ করিতে পারে। আনন্দই মনুষ্য

জীবনের একমাত্র কাম্য। এই অভাবের হাত হইতে পরিত্রাণ না পাইলে নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ লাভ করা যায় না। আর একমাত্র কারণকে জানিতে পারিলেই মানুষের সকল বাসনার সমাধা হয়। সুতরাং পরম শান্তিলাভের একমাত্র পথই হইল কারণকে জানিবার চেষ্টা করা।

বেদে কথিত আছে, আদিতে ভগবান্ একা ছিলেন। তিনি স্ব-ইচ্ছায় বহুতে বিভক্ত হইয়াছেন। ভগবানের এক-একটি ভাবের প্রকাশই হইল তাঁহার এই অনন্ত সৃষ্টি। সেই আদি কারণকে জানা মানে, এই স্থূল পরিদৃশ্যমান জগৎ হইতে আরম্ভ করিয়া ইহার সূক্ষ্ম ও কারণ-অবস্থা এবং এই জগতের অতীত সেই সর্ব্বকারণের আদি কারণ, যাহা হইতে এই বিশ্ব-জগৎ উদ্ভূত হইয়াছে, তৎসমুদয়কেই জানা। এই চরম কারণকে জানিবার জন্য মনীষিগণ যুগে-যুগে কত কঠোর সাধনা বা তপস্যা করিয়াছেন।

বহুর জ্ঞান লাভ করিতে করিতে এককে জানা এবং এককে ধরিয়া বহুকে জানা—এই দুই উপায়ে মহাত্মাগণ এই তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছেন। বহুর ভিতর দিয়া এককে জানিতে হইলে সৃষ্টিতত্ত্ব বা দেহতত্ত্ব সম্বন্ধে জ্ঞানের প্রয়োজন।

সৃষ্টিতত্ত্ব বা দেহতত্ত্ব এক জিনিষ—সৃষ্টির অনুরূপ করিয়াই দেহটা তৈয়ারী হইয়াছে। যাহা যাহা সৃষ্টিতে আছে, ক্ষুদ্রাকারে দেহেতেও তাই আছে, তাই বলা হয় "যাহা আছে ব্রহ্মাণ্ডে তাহা আছে পিণ্ডে"। সুতরাং দেহতত্ত্ব ঠিকভাবে বুঝিতে

পারিলে সৃষ্টিতত্ত্বও বুঝিতে পারা যায়। শাস্ত্রে একটি ব্যষ্টি অপরটি সমষ্টি নামে বর্ণিত হইয়াছে। ইংরাজীতে একটিকে ম্যাক্রোকজম্ (Macrocosm) এবং অপরটিকে মাইক্রোকজম্ (Microcosm) বলা হয়। ইহা ছাড়া বাইবেলে আরও দেখা যায় যে "God has created man after His own image."—অর্থাৎ ঈশ্বর নিজের অনুরূপ করিয়া মানুষ সৃষ্টি করিয়াছেন। সুতরাং সৃষ্টি সম্বন্ধে সম্যক্ জ্ঞান লাভ করিতে হইলে মানুষের দেহের ভিতর দিয়া ছাড়া অন্য কোন উপায়ে লাভ করা যায় না। এই কারণে দেখা যায়, পূর্ব্ব পূর্ব্ব যোগী-ঋষিগণ একমাত্র দেহতত্ত্বের অনুশীলন দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান লাভের অধিকারী হইয়াছিলেন।

বাষ্প ঘনীভূত হইয়া যেরূপ জলে পরিবর্ত্তিত হয় এবং জলও ঘনীভূত হইয়া বরফে পরিণত হয়, সেই শুদ্ধ চৈতন্য-সত্তাও নানা বিবর্ত্তনের ভিতর দিয়া এই জড়রূপ ধারণ করিয়াছে। ইহার এক-একটি বিবর্ত্তনকেই এক-একটা স্তর বলা হয়। স্তর বলিতে সাধারণতঃ আমাদের মনে হয়, কোন কিছুর একটির পর আর একটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র অবস্থা। এই স্তরভেদ কিন্তু তদ্রূপ নয়। একখণ্ড বরফের মধ্যে উহার সর্ব্বত্র জুড়িয়া যেমন জলত্ব ও বাষ্প ওতপ্রোতভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে তেমনি এই জড়ের ভিতরও তাহার সূক্ষ্ম ও কারণতার দুইটিই একই সময়ে বর্ত্তমান রহিয়াছে। সদ্‌গুরুর উপদিষ্ট পন্থায় সাধনাদ্বারা এই এক-একটি স্তর বা অবস্থার সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করাকেই স্তরভেদ বা চক্রভেদ করা বলা হয়।

স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ-ভেদে এই সৃষ্টি সাধারণতঃ তিন ভাগে বিভক্ত। যথা :—

১। স্থূল—জড়রাজ্য—(Material division)

২। সূক্ষ্ম—মনোরাজ্য—(Mental division)

৩। কারণ—চৈতন্যরাজ্য—(Spiritual division)

আমাদের দেহের তিনটি প্রধান পদার্থ (factor) হচ্ছে—দেহ, মন ও আত্মা। বিজ্ঞান-জগতে কোন বৈজ্ঞানিকেরা বিজ্ঞানের কোন বিষয় গবেষণা করিতে গেলে যেমন কোন স্থূল পদার্থকে ধরিয়া ক্রমশঃ তাহার সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর তত্ত্বের অনুসন্ধানে স্থূল দেহ হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ তাহার সূক্ষ্ম ও কারণ-তত্ত্বের দিকে অগ্রসর হইয়াছিলেন। আর যিনি কারণের দিকে যত বেশী অগ্রসর হইতে পারিয়াছিলেন তিনি তত বড় উচ্চস্তরের জ্ঞানী বলিয়া খ্যাত।

ষট্‌চক্রভেদের কথা অনেকেই শুনিয়াছেন। এই চক্র বা স্তরগুলি জড়রাজ্য বা স্থূলদেহের অন্তর্গত। ইহাদের নাম নিম্নে দেওয়া গেল, যথা :—

১। মূলাধার—গুহ্যদেশে,
২। স্বাধিষ্ঠান—লিঙ্গমূলে,
৩। মণিপুর—নাভিদেশে,
৪। অনাহত—হৃদয়ে।
৫। বিশুদ্ধাখ্য—কণ্ঠে।
৬। আজ্ঞা—দ্বিদলে—
দুই চক্ষুর মধ্যস্থলে।

উপরোক্ত এই ছয়টি ক্ষুদ্র স্তর বা চক্র মানুষের মেরুদণ্ডের মধ্যে সুষুম্না নাড়ীর অন্তর্গত। এইরূপ স্থূল বা জড়রাজ্যের

ন্যায় সূক্ষ্ম বা মনোরাজ্যে এবং কারণ বা চৈতন্য-রাজ্যে এই দুইটি বিভাগেও প্রতিটি বিভাগে ছয়টি করিয়া বারটি ক্ষুদ্র স্তর আছে। তাহা হইলে তিনটি প্রধান বিভাগে সর্ব্বসমেত আঠারটি ক্ষুদ্র স্তর আছে জানা গেল। এই আঠারটি ক্ষুদ্র স্তর যিনি ভেদ করিয়াছেন তিনি চরম জ্ঞানলাভ করিয়াছেন বা তাহার চরম-ধাম প্রাপ্তি হইয়াছে। উপরোক্ত তিনটি প্রধান বিভাগের নাম নিম্নে দেওয়া গেল, যথা :—

১। স্থূল বা জড়রাজ্যে—পিণ্ডদেশ—মেডিউলা অবলংটা (Medula Oblongta) পিণ্ডদেশের সহিত সম্বন্ধযুক্ত।

২। সূক্ষ্ম বা মনোরাজ্য—ব্রহ্মাণ্ডদেশ—সেরিবেলন্ (Cerebellum, gray matter)—ব্রহ্মাণ্ড-দেশের সহিত সম্বন্ধ-যুক্ত।

৩। কারণ বা চৈতন্যরাজ্য—দয়ালদেশ—সেরিব্রম (Cerebrum, white matter) নির্ম্মলচৈতন্য-দেশের সহিত সম্বন্ধ-যুক্ত।

জড়রাজ্যের ন্যায় মনোরাজ্য বা সূক্ষ্মদেহ অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত ছয়টি স্তর, যথা :—

১। শিবলোক, ৪। সহস্রদল কমল,
২। ব্রহ্মলোক, ৫। ত্রিকুটী,
৩। বিষ্ণুলোক, ৬। দশমদ্বার (শূন্য)

দয়াল-দেশের অন্তর্গত কারণ বা চৈতন্য রাজ্যের আর ছয়টি স্তরের নাম, যথা :—

১। ভ্রমর গুম্ফা, ৪। অগমলোক,
২। সত্যলোক (বৈষ্ণবশাস্ত্রে ইহাকে গোলক বলিয়া থাকে) ৫। অনামীলোক,
৩। অলখ লোক ৬। রাধাস্বামীধাম।

কারণরাজ্যে বা দয়ালদেশে নির্ম্মল চৈতন্য মাত্র, তথায় মায়া নাই। ব্রহ্মাণ্ড-দেশে নির্ম্মল-চৈতন্য সূক্ষ্ম মায়াযুক্ত।

মায়া—(মা ধাতু পরিমাণে) অর্থাৎ সীমাবিশিষ্ট অথবা আকারবিশিষ্ট। তাই পিণ্ড বলিতে আকারবিশিষ্ট অথবা জমাট-বাঁধা, ব্রহ্মাণ্ড বলিলে—(বৃনহ ধাতু বিস্তারে), জমাট বাঁধার পূর্ব্বাবস্থা, অর্থাৎ বরফের তুলনায় যেমন জল।

শাস্ত্র-অধ্যয়নে দেখা যায় যে, যোগীগণ পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে পিণ্ডদেশের (স্থূলের) প্রথম চক্র মূলাধার হইতে আরম্ভ করিয়া সহস্রদল পর্য্যন্ত পৌঁছিয়া শান্তিলাভের কথা বলিয়া গিয়াছেন, অর্থাৎ তাঁহারা স্থূল বিভাগের (পিণ্ডদেশের) ছয়টি ক্ষুদ্র স্তর অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মাণ্ড-দেশে পৌঁছিয়াছিলেন। কেহ কেহ বা তাহার উপরের স্তরের কথাও বলিয়া গিয়াছেন। এইরূপ ভাবে সাধকের শক্তির তারতম্য অনুসারে যিনি যতদূর অগ্রসর হইয়াছিলেন অর্থাৎ যাহার যে-স্তরে পৌঁছিয়া লয় আসিয়াছে, তিনি সেই স্তরকেই চরম বলিয়া স্বীকার করিয়া গিয়াছেন এবং নিজ নিজ শিষ্যগণের মধ্যে সেই উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। এই কারণে অনেকে বলেন, "যত মুনি তত মত।"

চরমধামে পৌঁছিবার বহুপূর্ব্বে স্থানে স্থানে লয় আসে এবং যেখানে লয় আসে সেই স্থানকেই চরম বলিয়া বোধ হয়। লয় না আসিলে তাহার পরেও যে আরও আছে তাহা জানিবার জন্য চেষ্টা আসে।

এইরূপে সেই এক পরম তত্ত্বলাভের সন্ধানে সকলেই চলিয়াছিলেন বটে, কিন্তু শক্তির তারতম্য অনুসারে প্রাপ্তিরও

তারতম্য হইয়াছে। পিণ্ডদেশ ও ব্রহ্মাণ্ডদেশ অতিক্রম করিয়া দয়াল-দেশে বা নির্ম্মলচৈতন্যদেশে না পৌঁছিলে মায়ার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায় না—জন্ম ও মরণ থাকে। জড়-রাজ্যে মরণ সত্বর হয়, সূক্ষ্মরাজ্যে মরণ বিলম্বে হয়—এইমাত্র প্রভেদ। পিণ্ডদেশ অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মাণ্ডদেশে গেলেও জন্ম ও মরণ থাকে।

গীতায় আছে—

> আব্রহ্ম ভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোর্জ্জুন।
> মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে॥—গীতা ৮।২৬

অর্থাৎ হে অর্জ্জুন! ব্রহ্মলোক হইতেও জীবগণ পুনরায় জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে, কিন্তু হে কৌন্তেয়, আমাকে প্রাপ্ত হইলে লোকের পুনর্জন্ম হয় না।

তাহা হইলে লয়ের সঙ্গে সঙ্গে তথাকার অধিষ্ঠাত্রী দেবতাদেরও লয় নিশ্চয়ই হইবে। আর আমরা যদি সাধনা দ্বারা পিণ্ডদেশ অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মাণ্ডদেশের সহস্রদলে বা তথাকার অন্য কোন স্তরে পৌঁছাই, তথায় আমরা না হয় লয়কাল পর্য্যন্তই থাকিতে পারিব—তারপর আমাদেরও লয় হইবে, পুনরায় সৃষ্টির সময় আবার সৃষ্ট হইব। গীতায় আছে—

> "যদ্ গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম," —গীতা ১৫।৬

অর্থাৎ যোগীগণ যাহা প্রাপ্ত হইয়া পুনরায় সংসারে আবর্ত্তন করেন না সেই আমার পরমধাম অর্থাৎ স্বরূপ।

এখন সেই পরমধাম কোথায়? যেখানে গেলে আর ফিরিয়া আসিতে হইবে না—সেই স্থান ঐ চৈতন্যরাজ্য বা দয়ালদেশ।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের স্থান এই দয়ালদেশের দ্বিতীয় স্তর 'সত্যলোক', যাহাকে বৈষ্ণবেরা গোলক বলে। এই দয়াল-দেশে পৌঁছিলে আর জন্ম-মরণের অধীন থাকিতে হয় না।

যাহারা দয়ালদেশের এই দ্বিতীয় স্তর সত্যলোক পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছেন তাহাদের হিন্দিভাষায় 'সন্ত' বলা হয়। আর শেষ অষ্টাদশ স্তর পর্য্যন্ত যাহাদের গতি তাহাদিগকে 'পরমসন্ত' বলা হয়, সন্ত-শাস্ত্রে সাধকের স্তরগুলি পরিষ্কার ভাবে দেখান আছে।

সদ্গুরু

এই 'সন্ত' বা 'পরমসন্ত'কে সদ্গুরু বলা হয়। যিনি পিণ্ডদেশ অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মাণ্ডদেশে পৌঁছিয়াছেন তিনি গুরুপদবাচ্য বটে কিন্তু তাঁহাকে সদ্গুরু বলা যায় না, কারণ তিনি মায়ার হাত হইতে নিষ্কৃতি পান নাই এবং জন্ম-মরণের অধীন। ঋষিবাদ দিয়া ঋষিবাদ অনুসরণের ফলে এ দেশে উপরোক্ত সদ্-গুরু, গুরু ও সাধকগণকে মানুষ সাধারণতঃ সাধু-মহাত্মা বলিয়াই জানে। কিন্তু শুধু সাধু-মহাত্মা বা মহাপুরুষ বলিলে তিনি কোন্ পর্য্যায়ের বা কোন্ স্তরের তাহা সম্যক-রূপে বুঝা যায় না, যেমন—কেবল বিদ্বান্ বলিলে বুঝা যায় না তিনি কত বড় বিদ্বান্—ইনি আই-এ, বি-এ, কি এম্-এ বলিলে যেমন পরিষ্কারভাবে বুঝা যায়।

এই সকল না জানার জন্য অনেককে বলিতে শুনা যায় যে গুরু শব্দটির আগে সদ্ শব্দটি ব্যবহার করা হয় কেন?

একজনকে গুরু বলা হয় এবং একজনকে সদ্‌গুরু বলা হয়। গুরু সকলই এক—একজনকে সদ্‌গুরু বলাতে যাহাকে শুধু গুরু বলা হয় তাঁহাকে প্রত্যক্ষভাবে উপেক্ষা বা অবজ্ঞা করা হয় মাত্র। কিন্তু প্রকৃত কারণ উদ্‌ঘাটিত হইলে যাহা দেখা যায় তাহাতে অতি সহজেই বুঝা যায় যে কাহাকেও উপেক্ষা বা অবজ্ঞা করা হয় না। যিনি যাহা, তাহাকে তাহাই বলা হয় মাত্র। অমুক এম-এ বলিলে যিনি বি-এ তাহাকে উপেক্ষা বা অবজ্ঞা করা হয় না, কিংবা অমুক বি-এ একথা বলিলে যিনি আই-এ তাহাকে উপেক্ষা বা অবজ্ঞা করা হয় না। সকলেই বিদ্বান্। তবে যিনি যেরূপ বিদ্বান্ তাহাকে তাহাই বলা হয় মাত্র। ইহাও তদ্রূপ।

অস্ (হওয়া, থাকা)+অৎ (শতৃ কর্ত্তৃবাচ্যে) ইতি সৎ, অর্থাৎ যাহার সত্তা আছে বা যে বাঁচিয়া আছে এবং আরোতর-ভাবে বাঁচিবার দিকে চলিয়াছে তাহাই সৎ। আর যাহা ইহার ব্যত্যয় ঘটায় বা বাঁচা বা আরোতর করিয়া বাঁচা ও বৃদ্ধি পাওয়ার অন্তরায় ঘটায় তাহাই অসৎ।

সদ্‌গুরু কাহাকে বলে এবং তাঁহাকে চিনিবার উপায় কি এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র বলিয়াছেন—

'যিনি ইষ্ট-পরিপূরণে আপ্রাণ হ'য়ে তৎপ্রতিষ্ঠার ভিতর দিয়ে চরিত্রকে চারিয়ে তাঁরই স্বার্থ-অনুসন্ধিৎসায় বাস্তব জানায় জীবন ও বৃদ্ধির বিধিগুলিকে অনুভূতিতে কুড়িয়ে পেয়েছেন, তিনি যেমনই হউন, প্রকৃত সদ্‌গুরু তিনিই। সৎ মানে হ'চ্ছে—জীবন ও বৃদ্ধি যা'তে আছে, আর গুরু—বিশেষভাবে তা' যিনি জানেন।

"আর সদ্‌গুরু বলতে আমরা এই বুঝে থাকি—যিনি জীবন ও বৃদ্ধি যাহা যাহা দিয়া হইতে পারে, তাহা বিশেষ ভাবে জানেন। তাহা হইলেই সদ্‌গুরু চেন্‌বার ঐ একটা জিনিষই প্রথম ও প্রধান ব'লে পরিগণিত হ'তে পারে—যাকে সদ্‌গুরু ব'লে মনে কচ্ছি, তিনি কতখানি তাঁর যা'-কিছু বৃত্তি দিয়ে বাস্তব ইষ্টস্বার্থ-পরায়ণ, আর এই ইষ্টস্বার্থ-পরায়ণতার অভিব্যক্তিতে তা' পরিপুষ্টির হেকমতি—অর্থাৎ দক্ষতা ও ক্ষিপ্রতা-সমন্বিত কায়দা ও কৃতকার্যতা কেমনতর। আর এই ক্ষিপ্রতা ও দক্ষতা-কুশল ইষ্টস্বার্থ-পরায়ণ কৃতকার্য যিনি, তিনিই যদি জীবন ও বৃদ্ধির বিধি বাৎলে দেন আর তার চলনার কায়দা ব'লে দেন—তাতে আপ্রাণ অনুসরণে ঐ চলনার-বিধি অবলম্বন ক'রে যদি আমরা চলি, কৃতকার্যতা যে আমাদের নতজানু অভিবাদনে নন্দিত ক'রে তুলবে সে-সম্বন্ধে আর কোন ভুল নেইকো। সদ্‌গুরুর যদি বাস্তব কোন পরিচয় থাকে, তবে তা ঐ দিয়েই, নতুবা কারু জানা যদি কোন ভাবে কোন দিক্ দিয়ে উন্নত চলনে চালু করে দেয়, গুরুত্বের অভিবাদনে তো তুমি তাঁতেই কৃতকার্যতার ধন্য হ'তে পার। কিন্তু তাই ব'লে সবাই তোমার সর্ব্বতোভাবে অনুসরণীয় নয় একথা ঠিক জেনো—ঐ সদ্‌গুরু ছাড়া।"

—'কথাপ্রসঙ্গে'—শ্রীশ্রীঠাকুর।

এই সদ্‌গুরু আবার দুই শ্রেণীতে বিভক্ত—১। তত্ত্ব-পুরুষ, ২। তত্ত্বজ্ঞ পুরুষ। আমরা তত্ত্বপুরুষদের অবতার বলি এবং যাঁহারা তত্ত্বজ্ঞ তাঁহাদের সিদ্ধপুরুষ, মহাত্মা বা মহাপুরুষ বলিয়া থাকি। তত্ত্বপুরুষগণ সর্ব্ব জ্ঞান, গুণ ও শক্তি লইয়া নরদেহে অবতীর্ণ হন এবং যাঁহারা তত্ত্বজ্ঞ তাঁহারা সাধারণভাবে অভ্যাস দ্বারা তত্ত্ব উপলব্ধি করিয়া জ্ঞানী হন বা সিদ্ধ হন।

পূর্ণ সদ্‌গুরু তিনিই—

১। যিনি পূর্ণ জ্ঞান ও প্রেমের অধিকারী অথচ নিরভিমানী।

২। যিনি ছলে, বলে বা কৌশলে সর্ব্বজীবের মঙ্গলচেষ্টায় সতত যত্নবান্।

৩। যিনি কাহাকেও কোন প্রকার দুঃখ দেন না, অথচ অসতের প্রশ্রয় দেন না।

৪। যিনি মান, অপমান, ঘৃণা, লজ্জা, ভয়, দ্বেষ, হিংসা ও অহঙ্কারবিহীন এবং সর্ব্বক্ষেত্রে সমদর্শী।

৫। যিনি প্রশান্ত, ধীর, গম্ভীর, নিন্দা, স্তুতি বা সুখদুঃখে অবিচলিত।

৬। যিনি সরল, সহজ ও স্বভাবসুন্দর। সাধারণ মানুষের ন্যায় যিনি সংসারে বিচরণ করেন—কোন প্রকার অলৌকিকত্ব বা বিশেষত্ব দেখান না।

৭। যিনি অক্রোধী, সদা আনন্দময়, মিষ্টভাষী এবং মায়াধীশ।

৮। যিনি কাহারও দোষদর্শন করেন না। যাঁহার চলা, বলা, আচার, ব্যবহার সবই মধুর এবং যাঁহার সমস্ত প্রশ্নের মীমাংসা হয়ে গেছে।

৯। এক কথায় বলতে গেলে—যাঁর কোন মূর্ত্ত আদর্শে কর্ম্মময় অটুট আসক্তি, সময় ও সীমাকে ছাপিয়ে তাঁকে সহজভাবে ভগবান করে তুলেছে। যাঁর কাব্য, দর্শন ও বিজ্ঞান মনের ভালমন্দ বিচ্ছিন্ন সংস্কারগুলিকে ভেদ করে ঐ আদর্শতেই

সার্থক হ'য়ে উঠেছে—তিনিই সদ্‌গুরু। যেমন স্বামী বিবেকানন্দ—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের মধ্য দিয়ে, মহাত্মা কবীর—গুরু রামানন্দের মধ্য দিয়ে এবং অর্জ্জুন—শ্রীকৃষ্ণের মধ্য দিয়ে সার্থক হ'য়ে উঠেছিলেন।

এই সদ্‌গুরুকে চিনিবার উপায় সম্বন্ধে 'সত্যানুসরণে' শ্রীশ্রীঠাকুর বলিয়াছেন—

"পরীক্ষক না সেজে সংকীর্ণ সংস্কার বিহীন হ'য়ে ভালবাসার হৃদয় নিয়ে, দীন ও যতদূর সম্ভব নিরহঙ্কার হ'য়ে যেতে পারলে তিনি কৃপা করেন, ধরা দেন। অহঙ্কারের কষ্টিপাথরে তাঁকে কষা যায় না। কারণ, তিনিও সাধারণ জীবের ন্যায় সংসারে থাকেন। প্রেমীই তাঁকে ধরতে পারে।"

অনেকেই মহাপুরুষকে চিনিতে চান তাঁর অলৌকিকত্বের ভিতর দিয়ে। তাঁহারা স্পষ্টই বলেন—যদি তিনি সদ্‌গুরুই হন বা মহাপুরুষই হন তো আমাদের কিছু দেখান, তবে বিশ্বাস করিব, কিন্তু যিনি প্রকৃত সদ্‌গুরু তিনি কোন অলৌকিকত্ব দেখান না।

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের ভাববাণীতে আছে—

"না, তাঁর ভিতর কোন miracle (অলৌকিকত্ব) নাই, তাঁর অজানা কিছুই নাই। জীবের ভিতর miracle (অলৌকিকত্ব) আছে, কারণ সে দেখে নাই, গুরুমুখী হ'লেই সে দেখতে পায় miracle (অলৌকিকত্ব) দেখান; কি সত্যের against-এ (বিরুদ্ধে) command (হুকুম), তা' সদ্‌গুরুর ভিতর দিয়ে বেরুতে পারে না। আর বেরুলে তিনি সদ্‌গুরু নন।"

সৎসঙ্গ

যাহার অস্তিত্ব ও প্রকাশ আছে তাই সৎ। দেখিতে পাওয়া যায়, জগতের প্রতি পদার্থেরই অস্তিত্ব ও বিকাশ আছে, এই কারণে তৎসমুদয়কে সৎ বলা যাইতে পারে। কিন্তু জাগতিক সকল পদার্থই পরিবর্ত্তনশীল, সুতরাং সৎ হইলেও তাহা পরিবর্ত্তনীয় সৎ। ইহা সহজ বোধগম্য যে, যাহা হইতে এই জগৎ উৎপত্তি হইয়াছে, যিনি চিরস্থায়ী, শাশ্বত, একমাত্র সেই আদিকারণকেই প্রকৃতপক্ষে সৎ বলা যাইতে পারে। সুতরাং সৎসঙ্গ বলিলে—তাঁহারই সঙ্গ—অর্থাৎ আদি কারণের সহিতই সঙ্গ করা বুঝায়। শাস্ত্রে আছে "ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্ম এব ভবতি" (অর্থাৎ যিনি ব্রহ্মবিৎ তিনিই ব্রহ্ম)। অতএব ব্রহ্মজ্ঞ গুরুর সঙ্গ করাই হইল প্রকৃত সৎসঙ্গ, কারণ তাঁহার মধ্যেই যে আদি চৈতন্যের বিশেষত্ব সম্যক্ প্রস্ফুটিত। সদ্‌গুরুই সেই আদি কারণের—সেই সৎ, চিৎ ও আনন্দ-সত্তার মূর্ত্ত জীবন-বিগ্রহ। সাধকের নিজের চৈতন্যকে বিশেষত্বে পরিণত করিতে হইলে জীবন্ত সদ্‌গুরুতে যুক্ত হইয়া তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করতঃ নির্ব্বিচারে তাঁহার আদেশ মানিয়া চলিয়া তাহার নিজের ভিতর সেইভাবে স্ফুরণ করিতে হইবে। সদ্‌গুরুকে যিনি যত বেশী ভালবাসিতে পারিবেন তিনি আদি কারণকে তত বেশী জানিতে পারিবেন।

সাকার ও নিরাকার

শাস্ত্রে গুরুর স্তোত্রের ভিতর আছে যে গুরুই ব্রহ্ম,

গুরুই বিষ্ণু, গুরুই মহেশ্বর, গুরুর উপর আর কেহই নাই। শাস্ত্রে গুরুর স্তোত্রে আরও দেখা যায়—"ন গুরোরধিকং তত্ত্বং ন গুরোরধিকং তপঃ।" অর্থাৎ গুরুর অধিক কোন তত্ত্ব বা তপস্যা নাই। সাধক চণ্ডীদাসও বলিয়াছেন—

"শোন হে মানুষ ভাই!
সবার উপরে মানুষ সত্য
তাহার উপরে নাই।"

আবার নরবিগ্রহরূপে অবতীর্ণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—

অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূত মহেশ্বরম্॥
—গীতা ৯।১১

মহাত্মানস্তু মাং পার্থ দৈবীং প্রকৃতিমাশ্রিতাঃ,
ভজন্ত্যনন্যমনসো জ্ঞাত্বা ভূতাদিমব্যয়ম্॥
—গীতা ৯।১৩

অর্থাৎ মূঢ়েরা আমার পরম মহেশ্বর-ভাব না জানিয়া মানুষ-দেহধারী আমাকে অবজ্ঞা করে, কিন্তু মহাত্মারা আমাকে দৈবী প্রকৃতি-আশ্রিত ভূত-সকলের আদি ও অব্যয় জানে ভজনা করেন। বৈষ্ণব-শাস্ত্রেও আছে—

শ্রীকৃষ্ণের যতেক লীলা সর্ব্বোত্তম নর-লীল
নরবপু তাঁহার স্বরূপ,
গোপবেশ বেণুকর, নব কিশোর নটবর
নরলীলার হয় অনুরূপ।

মহাত্মা কবীরও এ সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

"নিরাকারকি আরসি সাধোঁকি দেহ।

লখা যো চাহে অলখ্ কো তোইনহিমে লখলেহ॥"

অর্থাৎ সাধুর দেহ নিরাকারের আয়নাস্বরূপ, যদি সেই অলখ পুরুষকে কেহ দেখতে চাও, তাহ'লে এই সাধুর দেহের ভিতর দেখে লও।

তাহা হইলে উপরোক্ত আলোচনাদ্বারা আমরা দেখিতে পাইতেছি যে গুরুই পরব্রহ্ম এবং গুরুর অধিক কোন তত্ত্ব বা তপস্যা নাই এবং মনীষী, অবতার ও মহাপুরুষগণও বলিয়াছেন যে মানুষই সত্য—তাহার উপর নাই—নরলীলাই ভগবানের শ্রেষ্ঠ লীলা—এবং নরদেহই ভগবানের স্বরূপ, এবং গুরুদেহই নিরাকারের আয়না-স্বরূপ এবং তাহার ভিতর দিয়াই ভগবানকে দেখা যায় বা জানা যায়। গুরুই যখন সব, তখন সেই প্রত্যক্ষ জীবন্ত ঈশ্বর ছাড়িয়া অন্য অপ্রত্যক্ষ মূর্ত্তিতে আসক্ত হওয়ার কোন আবশ্যকতা দেখি না। তবে এই গুরু সদ্‌গুরু হওয়া চাই—যাঁহার ভিতর ভগবানের পূর্ণ বিকাশ। 'সত্যানুসরণে' শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র বলিয়াছেন—

"গুরুই ভগবানের সাকার মূর্ত্তি আর তিনিই অখণ্ড (absolute)"।

শ্রীবিগ্রহ ও নিরাকার সম্বন্ধে চৈতন্যচরিতামৃতেও দেখা যায়—

শ্রীবিগ্রহ যে না মানে, নিরাকার মানে।

তারে তিরস্করিবারে কৈল নির্দ্ধারণে॥ —চৈঃ চঃ

মানুষই ভগবান এ সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দের উক্তি—

"যতই বল না কেন, যতই চেষ্টা কর না কেন, ভগবানকে মানুষ

ছাড়া আর কিছু ভাবিতে পার না। ঈশ্বর সম্বন্ধে, জগতের সকল বস্তু সম্বন্ধে খুব যুক্তিতর্ক-সমন্বিত বক্তৃতা দিতে পার, খুব যুক্তিবাদী হইতে পার, আর ভগবানের এই সকল মনুষ্যাবতারের কথা সব ভ্রমাত্মক, ইহা এমনভাবে প্রমাণ করিতে পার যাহাতে তোমার সম্পূর্ণ তৃপ্তি হয়, কিন্তু সহজ বুদ্ধিতে কি হয় একবার ভাবিয়া দেখ দেখি? এইরূপ অদ্ভূত বিচার-বুদ্ধিদ্বারা কি লব্ধ হয়? কিছুই নয়—শূন্য; কেবল কতকগুলি বাক্যাড়ম্বর মাত্র।

এখন হইতে যদি কোন লোক এইরূপ অবতার-পূজার বিরুদ্ধে মহাযুক্তি-তর্কের সহিত বক্তৃতা করিতেছেন দেখ, তবে তাহার হাত ধরিয়া জিজ্ঞাসা কর—ভাই, তোমার ঈশ্বর-ধারণা কি? সর্ব্বশক্তিমত্তা, সর্ব্বব্যাপিতা ও এতদ্বিধ শব্দে কি বোঝায়? তাহা তিনি ঐ শব্দগুলির বানান ব্যতীত আর অধিক কি বুঝেন? এ সকল শব্দের দ্বারা তাঁহার মনে কোনও ভাববিশেষেরই উদয় হয় না। তিনি ইহাদের অর্থ-স্বরূপে এমন কোন ভাব ব্যক্ত করিতে পারেন না যাহাতে তাঁহার মানবীয় প্রকৃতির কোন সম্পর্ক নাই, এই বিষয়ে, রাস্তার যে লোকটি একখানা পুঁথিও পড়ে নাই, তাহার সহিত ইহার কিছুমাত্র প্রভেদ নাই; তবে সে-লোকটা শান্ত-প্রকৃতি, জগতের শান্তি ভঙ্গ করে না—আর এই লম্বা-চওড়া বাক্যব্যয়কারী ব্যক্তি সমাজে অশান্তি ও দুঃখ আনয়ন করে; তাহার প্রতি কঠোরতর ভাষা প্রয়োগ না করিলে তাহাকে প্রলাপভাষী বলিতে হয়। তাহার ধর্ম্ম বিকৃতমস্তিষ্ক ও মস্তিষ্কহীনগণেরই উপযুক্ত।

—স্বামী বিবেকানন্দ।

পাশ্চাত্য মনীষী বার্ণার্ড শ এ সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

"Beware of the man whose God is in the skies."

অর্থাৎ যাহার ভগবান আকাশে তাহার সম্বন্ধে সতর্ক হও—সাবধান হও।

এই সাকার অর্থাৎ প্রত্যক্ষ ভগবানকে বাদ দিয়া নিরাকার অর্থাৎ অপ্রত্যক্ষ ভগবানের উপাসনা যে কেবলমাত্র ক্লেশকর ও বিড়ম্বনামাত্র এ-সম্বন্ধে গীতাতেও আছে। যথা—

ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্।
অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে॥ —গীতা ১২।৫

অর্থাৎ অব্যক্তে (নিরাকারে) আসক্তচিত্ত দেহাভিমানী পুরুষ বহুতর ক্লেশ পায়।

পাতঞ্জল দর্শনে ভগবান-সম্বন্ধে দেখা যায়—

"ক্লেশকর্ম্ম বিপাকাশয়ৈরপরামৃষ্টঃ পুরুষঃ বিশেষ ঈশ্বরঃ।"

অর্থাৎ ক্লেশ, কর্ম্ম, বিপাক, আশয় দ্বারা অপরামৃষ্ট যে পুরুষ তিনিই ঈশ্বর।

আমাদের মত সার্দ্ধ-ত্রিহস্ত পরিমিত নরদেহধারী—তিনি আবার ভগবান, ঈশ্বর, পুরুষোত্তম বা God হন কি করে? মানুষ কি কখনও ভগবান বা God হ'তে পারে? এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র বলিতেছেন—

ঐ যে একটা কথা আছে—

"ঐশ্বর্য্যস্য সমগ্রস্য বীর্য্যস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ।
জ্ঞান-বৈরাগ্যয়োশ্চৈব ষণ্ণাং ভগইতীঙ্গনা॥"

তা' হ'লে এর অর্থ কি এমনতর হবে না? ঐশ্বর্য্যস্য সমগ্রস্য মানে হ'চ্ছে সমগ্র ঐশ্বর্য্যের ঐশ্বর্য্য, ঈশ্বরের ভাব অর্থাৎ আধিপত্যের ভাব। বীর ধাতু মানে বিক্রমণ, (Steadily to go ahead) স্থির পাদক্ষেপে অগ্রগতি, অথবা ঈর্ ধাতু মানে প্রেরণা—প্রেরণা যাঁতে actively move কচ্ছে তিনি বীর, আর বীর্য্য যাঁতে আছে তিনি বীর্য্যবান্, যশ এসেছে অশ্ ধাতু থেকে, আর অশ্ ধাতু মানে বিস্তার-ভাব, তাহ'লে যশ মানেই

বিস্তারের ভাব। শ্রি-ধাতু মানে আশ্রয়, সেবা—যাঁতে আশ্রয়ের ভাব আছে, সেবার ভাব আছে, তিনিই হচ্ছেন শ্রীমান্। জ্ঞা-ধাতু মানে জানা—জানার ভাব বা জ্ঞান যাঁতে আছে তিনি জানার অধিকারী, জ্ঞানী। বৈরাগ্য এসেছে বি-পূর্ব্বক রঞ্জ-ধাতু হ'তে—তা'র মানে হ'চ্ছে, কোন কিছুতে রঞ্জিত না হওয়া, সব সময় uncoloured থাকা। কোন কিছুই যাঁকে রঞ্জিত বা রঙ্গিণ ক'রে তুলতে পারে না—তিনি প্রকৃত বৈরাগ্যবান্। এই ষড়্গুণকে 'ভগ' ব'লে থাকে। এই মিলিত ষড়্গুণ যাঁতে আছে অর্থাৎ যাঁতে এগুলি active হ'য়ে উঠেছে, তাঁকে যদি আমরা ভগবান বলি তাহ'লে কি কিছু অন্যায় হবে ?"

—নানাপ্রসঙ্গে, ৩য় খণ্ড, ১০ পৃঃ॥

সদ্গুরুর লক্ষণ কি তাহা পূর্ব্বে বিশদভাবে বলা হইয়াছে। প্রত্যেক যুগেই দেখা যায়, মানুষ এতদূর জানিয়া-শুনিয়াও অবতার যখন আসেন তখন খুব অল্প লোকেই তাঁহাকে বুঝিতে ও ধরিতে পারে। তাঁহার শুভ আবির্ভাবের কথা প্রচার আরম্ভ হইলে অধিকাংশ লোকই দেখা যায়, তাঁহার বিরুদ্ধ সমালোচনা ও নিন্দাচর্চ্চা করিয়া থাকে। এই অবতারকে অর্থাৎ নরদেহধারী ভগবানকে মানুষ কেন চিনিতে পারে না এ-সম্বন্ধে ভগবান্ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিয়াছেন—

"নরলীলায় অবতারকে ঠিক মানুষের মত আচরণ করিতে হয়—তাই চিনতে পারা কঠিন। সেই ক্ষুধা, তৃষ্ণা, রোগ, শোক কখনও বা ভয়—ঠিক মানুষের মত।" —শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত, ৪র্থ ভাগ।

নিরাকার ভগবান তো আমাদের মত চলিয়া ফিরিয়া বা আচরণ করিয়া আমাদের দেখাইতে বা শিক্ষা দিতে পারেন না, তাহা করিতে গেলে যেরূপ হইয়া তিনি আমাদের

আচরণের ভিতর দিয়া দেখাইতে ও শিখাইতে পারেন সেই রূপটি তাঁহার গ্রহণ করিতে হইবে; এই কারণে যখনি ধর্ম্মের গ্লানি হয়, অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হয়, যাহার ফলে তাঁর সৃষ্ট জীব জাহান্নমে যাইতে বসে, তখন তিনি ধর্ম্ম-সংস্থাপনের জন্য, জীবের উদ্ধারের জন্য নর-দেহে অবতীর্ণ হন। তিনিই অবতার, সদ্গুরু বা সাকার ভগবান। নিরাকারত্ব তাঁরই একটা দিক্ (aspect), অনুভূতির দ্বারা জ্ঞেয়। তাই গীতায় আছে—

যদা যদাহি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥ —গীতা ৪।৭

অর্থাৎ হে ভারত! যখন যখনই ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের আধিক্য বা প্রাধান্য হয় তখনই আমি আবির্ভূত হই।

পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥ —গীতা ৪।৮

অর্থাৎ সাধুদিগের পরিত্রাণের জন্য ও দুষ্কর্ম্মকারীর নাশের জন্য আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হই।

এই সসীমকে কেন্দ্র করিয়াই তাঁহার অসীমত্বের বোধ আমাদের মধ্যে জাগরিত হয় অর্থাৎ সদ্গুরুর (সসীমের) ভিতর দিয়াই অসীম রূপে—ভগবান রূপে ভাসিয়া উঠেন। তাই কবীর সাহেব বলিয়াছেন :—

"ফাঁকির খেলা নাইকো সেথা শব্দ জাগে যেথা।
সীমার মাঝে অসীম রহে জ্ঞানের সাথে সেথা॥"

নিরাকার অবস্থা

এই সদ্‌গুরুরূপী সাকার ভগবানের প্রতি ঐকান্তিক বৃত্তিভেদী টানে আমি যখন আমি-হারা হইয়া যাই তখনকার সেই আত্মহারা অবস্থাটা আমার ভাবাতীত, জ্ঞানাতীত ও নিরাকার অবস্থা। কারণ, এই আমি তখন জ্ঞেয়রূপে সেখানে থাকি না—ফুরাইয়া যাই, সেই অবস্থার যে অননুভূতপূর্ব্ব বোধ তাহাই নিরাকারত্ব।

অসীম জানিস্ সসীম হয়ে সীমায় করে বাস।
সসীমে দেখলে অসীম তবেই কাটে ফাঁস॥
অসীম যখন সহজজ্ঞানে সীমাতে লয় স্থান।
বৃত্তিভেদি টান হলে তায় দেখবি ভগবান।

—শ্রীশ্রীঠাকুর।

তাহা হইলে ইহা এখন সহজেই বুঝা যায় যে, বস্তু বাদ দিয়া কোন জ্ঞান লাভ করিবার উপায় নাই। বেদে ভগবানকে ব্রহ্ম বলিয়াছে। ব্রহ্ম তো নিরাকার, চৈতন্যস্বরূপ, 'অবাঙ-মনসোগোচরম্'। অতএব আমাদের কাছে অবস্তু। এই প্রকার নিরাকার ভগবান চিরকাল ছিলেন, আছেন ও থাকিবেন কিন্তু তাঁহাকে জানিতে গেলে তিনি যাঁহার ভিতর পরিদৃশ্যমান বা প্রকট হইয়াছেন সেই সসীম বা সাকার সদ্‌গুরু বা অবতারের ভিতর-দিয়া ছাড়া জানিবার আর অন্য কোন উপায় বা পথ নাই।

কিন্তু ভারতে বহুকাল যাবৎ ঋষি বাদ দিয়া ঋষিবাদের অনুসরণের ফলে আমাদের স্বভাব এখন এইরূপ হইয়াছে যে

আমরা ছাত্র হইয়া পুস্তকের অনেক কিছু সদুপদেশ পাঠ করিয়া থাকি এবং শিক্ষক হইয়া পুস্তকের অনেক কিছু সৎ-কথা ও সদুপদেশ পড়াইয়া থাকি এবং দেখা যায় যে এইরূপ ভাবে পুস্তক পড়িয়া ও পড়াইয়া আমরা পুস্তক বা বই হইয়া যাই, কোনও সদুপদেশ বা নীতি আমাদের স্বভাবে ফুটিয়া উঠে না—চরিত্রগত হয় না। কবি তাঁহার ভাষায় বলিয়াছেন—

"মহাজ্ঞানী মহাজন যে পথে ক'রে গমন
হ'য়েছেন প্রাতঃস্মরণীয়,
সেই পথ লক্ষ্য ক'রে স্বীয় কীর্তি ধ্বজা ধ'রে
আমরাও হ'ব বরণীয়।"

আমাদের কোন্ পথ অনুসরণ করা উচিত এ সম্বন্ধে চিন্তা করিতে গেলে দেখি যে বাল্যাবস্থায় তাহা আমরা বইতে পাঠ করিয়াছি। কিন্তু আমরা দেখিতে পাই যে আমরা বই হইয়া গিয়াছি—বক্তা হইয়াছি, বইয়ের সদুপদেশ বা কথাগুলি আমাদের মধ্যে ফুটিয়া ওঠে নাই বা চরিত্রগত হয় নাই। ইহার ফলে আমরা জীবনে বহু দুঃখদুর্দ্দশাগ্রস্ত হই—দিক্‌ভ্রান্ত হইয়া পড়ি। ইহার কারণ সম্বন্ধে শাস্ত্রে দেখা যায়—

"ভবেদ্বীর্য্যবতী বিদ্যা গুরু বক্ত্র সমুদ্ভবা।
অন্যথা ফলহীনা স্যান্নির্বীর্য্যা চাতি দুঃখদা॥"

—শিব-সংহিতা—তৃতীয় পটল। ১১

অর্থাৎ বিদ্যা গুরুর মুখ হইতে লাভ করিলে বীর্য্যবতী হয়। গুরুর উপদেশ ব্যতীত বিদ্যালাভ করিতে গেলে—সাধনা করিতে গেলে তাহা নির্ব্বীর্য্যা ও দুঃখ প্রদায়িনী হইয়া থাকে।

বর্ত্তমান যুগের জীবন্ত আদর্শ—সদ্‌গুরু শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র তাঁহার স্বীয় প্রেম, প্রজ্ঞা, কর্ম্ম ও দূরদৃষ্টির প্রভাবে আজ পৃথিবীতে লক্ষ লক্ষ লোকের দ্বারা যুগপুরুষোত্তম বলিয়া পূজিত হইয়াছেন। গ্রন্থকার কর্ত্তৃক লিখিত "শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র" নামক তাঁহার জীবন-চরিত পাঠে পাঠকগণ তাঁহার জীবনী সম্বন্ধে সম্যক্ অবগত হইবেন। শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র যে সাধনপ্রণালী দিয়াছেন তাহাকে সন্তমতে 'সুরত শব্দযোগ' বলে। সুরত শব্দযোগের এই বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করিয়া শ্রীশ্রীঠাকুর স্বীয় বিচিত্র অভিজ্ঞতা-বলে দেশ-কাল-পাত্রোপযোগী করিয়া সর্ব্বসাধারণের হিতার্থে তদীয় বিজ্ঞান-সম্মত, সার্ব্বজনীন, অভিনব আদর্শ সাধনপদ্ধতি প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে ভারতের স্ত্রী, পুরুষ, বালক, বৃদ্ধ সহস্র-সহস্র নরনারী এই সহজ, সরল, বিঘ্নশূন্য অপূর্ব্ব সাধন-পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া সপারিপার্শ্বিক পরম মঙ্গলের ও জীবন বৃদ্ধির অধিকারী হইতেছেন। সৃষ্টিরাজ্যের আদ্যন্ত তাঁহার স্মৃতিতে সর্ব্বক্ষণ জাগরুক থাকায়—সেই আদিকারণের সঙ্গে নিতান্ত সহজভাবে যোগযুক্ত থাকিয়া তিনি স্বাভাবিকভাবে সংসারে চলিয়াছেন। নির্ম্মল চৈতন্যদেশ পর্য্যন্ত এই সকল বিভিন্ন স্তরের অনুভূতি এবং তৎ তৎ স্থানের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা, রূপ ও শব্দের বিস্তৃত বিবরণ প্রায়শঃ তিনি বলিয়া থাকেন। তাঁহার প্রদত্ত যাবতীয় ধামের সকল সুদীর্ঘ বিশদ বর্ণনা শ্রীশ্রীঠাকুর কথিত 'কথাপ্রসঙ্গে' তৃতীয় খণ্ড ও পরম শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত ব্রজগোপাল দত্তরায় মহোদয় লিখিত শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবনী হইতে নিম্নে প্রকাশ করা গেল, যথা—

স্তর বা মণ্ডল	**অধিষ্ঠাতৃ দেবতা**	**রূপ**	**শব্দ**
মূলাধার	পৃথ্বীবীজ	কাঁচাহলুদের রং	লং
স্বাধিষ্ঠান	বরুণবীজ	পাতলা লালচে রং	বং
মণিপুর	অগ্নিবীজ	অগ্নির রং, সঙ্গে অন্যান্য রং মিশ্রিত	রং
অনাহত	বায়ুবীজ	ঘোর রক্তবর্ণ	যং বা ক্লীং
বিশুদ্ধ	গগনবীজ	ধূম্র	হং
আজ্ঞাচক্র	হ্রীং বীজ	শুক্ল	হ্রীং
সহস্রদল কমল	নিরঞ্জন-পুরুষ	জ্যোতিঃ	ঘণ্টা ও শঙ্খ
বঙ্কনাল	সহস্রদল কমল এবং ত্রিকুটীর মধ্যবর্ত্তী সংকীর্ণ অন্ধকারময় বাঁকা রাস্তা।		ওঁ
ত্রিকুটি	প্রণব বা ওঁকার পুরুষ	গোলাপীরাগোদ্দীপ্ত প্রভাত সূর্য্যসদৃশ্য।	অন্তর্গত -মৃদঙ্গ ও মেঘগর্জ্জন
শূন্য বা দশমদ্বার	ররং পুরুষ	পূর্ণচন্দ্রসদৃশ্য প্রকাশমান।	ররং অন্তর্গত কিংগরী সারঙ্গ সেতার, করতাল ধ্বনি।
মহাশূন্য	অক্ষর পুরুষ	অন্ধকার কুণ্ডলী	এখানে শব্দ গুপ্ত।
ভ্রমরগুফা	সোহং পুরুষ	মধ্যাহ্নকালীন সূর্য্যসদৃশ।	সোহং অন্তর্গত মুরলী (বংশী) ধ্বনি।

সত্যলোক	সত্যপুরুষ	কোটি কোটি চন্দ্রসূর্য্য সদৃশ প্রকাশমান।	বীণাধ্বনি
অলখ লোক	অলখ-পুরুষ	ঐ	অনির্ব্বচনীয়
অগমলোক	অগম পুরুষ	ঐ	ঐ
অনামী লোক	অনামী পুরুষ	ঐ	ঐ
রাধাস্বামী ধাম	রক্তমাংস সঙ্কুল ইষ্ট রাধাস্বামী অনামী পুরুষ।	ঐ	রাধাস্বামী

ধর্ম্ম—গুরুবাদ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গেলে ধর্ম্ম সম্বন্ধে আলোচনা করা একান্ত প্রয়োজন, কারণ ধর্ম্ম-জীবনের ভিত্তিই হইল গুরুবাদ। ধর্ম্ম-জীবনের প্রথম সোপানই হইল গুরুগ্রহণ অর্থাৎ দীক্ষাগ্রহণ।

ধৃ ধাতু (ধারণ করা, পোষণ করা)+কর্ত্তরি মন্ প্রত্যয় করিয়া হইয়াছে ধর্ম্ম অর্থাৎ যাহা সকলকে ধরিয়া রাখে।

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র বলেন—

"ধর্ম্ম হচ্ছে তাই, যাতে নাকি অর্থাৎ যা করলে নাকি বাঁচা আর বৃদ্ধি পাওয়াটাকে অটুটভাবে ধ'রে রাখে।

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র আরো বলিয়াছেন—

"অন্যে বাঁচায় নিজে থাকে
ধর্ম্ম ব'লে জানিস তাকে।
ধর্ম্মে সবাই বাঁচে বাড়ে
সম্প্রদায়টা ধর্ম্ম নারে।

ধর্ম্মে জীবন দীপ্ত রয়
ধর্ম্ম জানিস একই হয়।
পূর্ব্বতনে মানে না যারা
জানিস নিছক ম্লেচ্ছ তারা।"

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র আরো বলেছেন—

"যেনাত্মনস্তথান্যেষাং জীবনং বর্দ্ধনাঞ্চাপি ধ্রিয়তে স ধর্ম্মঃ।" অর্থাৎ যাহার দ্বারা নিজের ও অপরের জীবন ও বৃদ্ধি বিধৃত হয় তাহাকেই ধর্ম্ম কহে।

শাস্ত্রে দেখা যায়—

ধর্ম্মে বর্দ্ধতি বর্দ্ধন্তি সর্ব্বভূতানি সর্ব্বদা।
তস্মিন হ্রসতি হীয়ন্তে তস্মাদ্ধর্ম্মং ন লোপয়েৎ॥

—ভীষ্মবাক্য, মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব ১৩।১৬

ঋষি কণাদও বলিয়াছেন—

"যতোঽভ্যুদয়ো নিশ্রেয়স সিদ্ধিঃ স ধর্ম্মঃ।"

অর্থাৎ যাহা হইতে জীবগণের অভ্যুদয় (উন্নতি) ও মুক্তি লাভ হয় তাহাই ধর্ম্ম। (নিঃশ্রেয়াস—যাহা হইতে নিশ্চিত শ্রেয় লাভ হয় অর্থাৎ মুক্তি হয়।)

ঋষি চাণক্য বলিয়াছেন—

"ধর্ম্মেণ ধার্য্যতে লোকঃ"

অর্থাৎ ধর্ম্ম লোক-জগৎকে ধরিয়া রাখিয়াছে।

স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন—

"যে ধর্ম্ম গরীবের দুঃখ দূর করে না, মানুষকে দেবতা করে না, তা'কি আবার ধর্ম্ম? ধর্ম্ম না পৈশাচ-নৃত্য।"

ঋষি চাণক্য তাঁহার অর্থশাস্ত্রে দৃঢ়তার সহিত প্রকাশ করিয়াছেন যে ধর্ম্ম, রাষ্ট্র, অর্থ, বিজ্ঞান পরস্পর ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ইহাদের কেহ কাহাকেও বাদ দিয়া দাঁড়াইতে পারে না, এবং ইহাদের সকলের ভিত্তিই হইল ধর্ম্ম। যথা—

"সুখস্য মূলং ধর্ম্মঃ
ধর্ম্মস্য মূলং অর্থঃ
অর্থস্য মূলং রাজ্যং
রাজ্যস্য মূলং ইন্দ্রিয়জয়ঃ
ইন্দ্রিয়জয়স্য মূলং বিনয়ঃ
বিনয়স্য মূলং বৃদ্ধোপসেবা
(জ্ঞানবৃদ্ধ অর্থাৎ ব্রহ্মবিদের সবা)
বৃদ্ধ সেবয়া বিজ্ঞানং।"

গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়েও দেখা যায়—

যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণো যত্র পার্থো ধনুর্দ্ধরঃ।
তত্র শ্রীর্বিজয়ো ভূতির্ধ্রুবা নীতির্মতির্মম॥

—গীতা ১৮।৭৮

অর্থাৎ যেখানে যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ, যেখানে ধনুর্দ্ধর পার্থ অর্থাৎ যেখানে ধর্ম্ম সেখানেই শ্রী (লক্ষ্মী), বিজয়, ভূতি অভ্যুদয়, বৃদ্ধি becoming) ও অমোঘনীতি দেখা যায়।

উপরোক্ত ধর্ম্ম সংজ্ঞার ভিতর-দিয়া আমরা বুঝিতে পারি যে তাহাই ধর্ম্ম, যাহার প্রতিপালনে আমরা সপারিপার্শ্বিক জীবন ও বৃদ্ধিতে—প্রাণনে-বর্দ্ধনে উচ্ছল ও উন্নত হইয়া উঠিতে পারি। ব্যষ্টি লইয়াই সমষ্টি। ব্যষ্টিকে বাদ দিয়া সমষ্টির কোন অভ্যুত্থান সম্পূর্ণ অর্থহীন। আর এই ধর্ম্ম মূর্ত্ত হয়

জীবন্ত আদর্শে অর্থাৎ গুরুতে। আদর্শের প্রতি অনুরাগ আনে বৃত্তি-নিয়ন্ত্রণ অর্থাৎ চরিত্র। আদর্শ বা ইষ্টের প্রতি বৃত্তিভেদী অনুরাগ বা টানের সহিত নাম-জপ ও ধ্যানে মানুষ লাভ করে জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও দূরদৃষ্টি। তখন ঐ ইষ্টানুরাগী মানুষ হয় সত্যিকার মনুষ্যপদবাচ্য। তখন সমাজপতি ইষ্ট বা আদর্শকে কেন্দ্র করিয়া লক্ষ-লক্ষ ইষ্টানুরাগী মানুষ লইয়া, এককে মানার ভিতর-দিয়া, একের আদেশে চলার ভিতর-দিয়া, এক ঐক্যবদ্ধ সংহতিসম্পন্ন বিরাট শক্তিশালী সমাজের হয় অভ্যুত্থান। ইহা কল্পনার সমগ্রী নয়—ইহা বাস্তব সত্য। সঙ্গে সঙ্গে জীবন্ত আদর্শের নির্দ্দেশানুযায়ী আসে সমাজে বৈশিষ্ট্যানুপাতিক শিক্ষা, আসে বিবাহ-সংস্কার (Marriage Reformation)। কন্যা বয়স্কা হইলেই বংশ, বর্ণ, বিদ্যা, স্বাস্থ্য ও ইষ্ট-নিষ্ঠায় যাঁহাকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করিবে, তাঁহাকে স্বামীত্বে বরণ করিবে, তিনি হইবেন ঐ কন্যার বর বা স্বামী। উমার ন্যায় স্বামীর প্রতি শ্রদ্ধাই করিবে ঐ নারীকে দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের মত সুসন্তানের জননী। এইরূপে ক্রমে ক্রমে সমাজে অনুলোম অসবর্ণ বিবাহ (নিম্নবর্ণের কন্যার সহিত উচ্চবর্ণের পুরুষের বিবাহ) হইবে প্রচলিত যাহার ভিতর-দিয়া পুনরায় এই সমাজে জন্মিবে ঘটোৎকচ ও বভ্রুবাহনের মত বীর সন্তান এবং জামদগ্নের ন্যায় বিরাট ঋষি, এবং প্রতিলোম বিবাহের (নিম্নবর্ণের পুরুষের সহিত উচ্চবর্ণের কন্যার বিবাহ) হইবে সম্পূর্ণ উচ্ছেদ। কারণ, ইহার ভিতর-দিয়া বংশদ্রোহী, জাতিদ্রোহী বা আর্য্য-বিগর্হিত সন্তান উৎপন্ন হয়।

এইরূপে সমাজের বা জাতির প্রতিব্যক্তি তাহার ব্যক্তিগত জীবনে জীয়ন্ত আদর্শ বা ঋষিগুরুর অনুশাসনে চলিলে কিরূপ বিরাট উন্নত সমাজদেহ গড়িয়া উঠিতে পারে তাহা ভাবিতে গেলে মনে পড়ে আমরা কাহার সন্তান—আর আজ পথহারা—দিকভ্রান্ত হইয়া কোথায় ism (বাদের)-এর পিছনে ছুটিয়াছি—পাগলের মত কত কিছু বুলি আওড়াইতেছি। আমাদের বংশের পরিচয় দিতে গেলে মুখে বলি সাবর্ণ গোত্র, সাণ্ডিল্য গোত্র, কাশ্যপ গোত্র, ভরদ্বাজ গোত্র ইত্যাদি। আমরা গোত্রধারী প্রতিটি আর্য্যসন্তান যে ঐ ঋষির বংশধর—ঋষির রক্ত আমাদের প্রত্যেকের ধমনীতে আজ প্রবাহিত হইতেছে ইহা একটু গভীরভাবে চিন্তা করতে গেলে নেপথ্যে যেন ধ্বনি শোনা যায়, কে যেন গুরুগম্ভীর স্বরে আমাদের দুর্দ্দশা দর্শনে আজ বলিতেছেন—"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ (ব্রহ্মজ্ঞ গুরু) নিবোধত (নিশ্চিতরূপে আত্মতত্ত্ব জ্ঞাত হও)। আজ যুগ-পুরুষোত্তম—বর্ত্তমান যুগের জীবন্ত আদর্শ শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র যে-ধর্ম্ম প্রবর্ত্তনে ব্রতী হইয়াছেন তাহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় আলোচনার ভিতর-দিয়া ও পরে প্রকাশ করা গেল; তাহা ভাবিতে গেলে মনে উদয় হয় সেই আর্য্য ঋষিদের কথা, যাঁহাদের কেন্দ্র করিয়া একদিন এই আর্য্য ভারতে আমাদের মধ্যে চতুরাশ্রম প্রচলিত ছিল। প্রতিটি আর্য্য সন্তানের (বিপ্র, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য—দ্বিজ মাত্রেই) জীবনটাকে ক্রমবিকাশের জন্য, ক্রমোন্নতির জন্য বিশেষ শ্রম করিয়া জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাকে অর্জ্জন করিবার উদ্দেশ্যে ঋষিগণ

চতুরাশ্রমের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। যথা—১। ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম ২। গার্হস্থ্যাশ্রম ৩। বাণপ্রস্থ ৪। সন্ন্যাস। বাঁচা ও বৃদ্ধি পাওয়াকে যাহা যাহা ধারণ করে তাহারই আচরণ-উদ্দেশ্যেই ইহা করা হইয়াছিল। এই স্বাভাবিক জীবনটাকে যে-যে বিধিমাফিক বিবর্ত্তনের পথে চলৎশীল করিয়া তুলিলে তাহা যথাযথ ভাবে সুগম হইতে পারে এই চতুরাশ্রমে পারম্পর্য্যানু-পাতিক তাহারই ব্যবস্থা ছিল।

আর্য্য দ্বিজগণ বাল্যকালে ছয় হইতে নয় বৎসরের মধ্যে আচার্য্য-সকাশে অর্থাৎ ঋষি-সকাশে উপনীত হইয়া 'ভৈক্ষং চর' সংকল্প গ্রহণ করিয়া দীক্ষা গ্রহণ করতঃ তাঁহাকে শ্রীগুরুপদে বরণ করিত। তথায় দীক্ষিত দ্বিজগণ নির্ব্বিচারে ঋষির অনুশাসন মানিয়া চলিতেন, তথাকার ব্রহ্মজ্ঞ গুরুকে (অর্থাৎ ঋষিকে) লোক-সেবার ভিতর-দিয়া ভিক্ষা করিয়া গুরুর সেবা বা ভরণপোষণ করিতেন। ইহাকে ঋষিযজ্ঞ বা ইষ্টভৃতি বলিত। ক্রমে-ক্রমে তাহাদের জীবন্ত আদর্শ ঋষিই হইয়া উঠিতেন তাঁহাদের জীবনের প্রিয়পরম। গুরুকে এইরূপ আপ্রাণ ভালবাসার ফলে তাঁহারা ঋষির রঙে রঙ্গীণ হইয়া উঠিতেন। এ সম্বন্ধে পাশ্চাত্য মনীষী গেটের অভিমত—

"We are shaped and fashioned by what we love."

অর্থাৎ আমরা যাহাকে ভালবাসি তাহার রঙে রঙ্গীণ হই। ব্রহ্ম কথাটিও আসিয়াছে বৃংহ ধাতু হইতে। বৃংহ ধাতু মানে বৃদ্ধি পাওয়া, দীপ্তি পাওয়া। মানুষ বা জীব বা জীবন যেমন করিয়া যাহাতে যাহাতে বৃদ্ধির দিকে অগ্রসর হয় তেমনতর

চলা, তেমনতর বলা—এক কথায় তেমনতর আচরণের নাম ব্রহ্মচর্য্য। ব্রহ্মচর্য্য-আশ্রম হইতে সমাবর্ত্তন লাভ করিয়া প্রত্যেক আর্য্যসন্তান এই দ্বিজত্বের মধ্য দিয়া আচার্য্যানুরাগ-বিধৃত জীবনে সমস্ত ইন্দ্রিয়কে নিয়ন্ত্রিত করিয়া গার্হস্থ্যাশ্রমে প্রবেশ করিতেন। সমাবর্ত্তন লাভ না করিলে কোন দ্বিজই বিবাহের অধিকারী বা যোগ্য হইতেন না। ইহাই ছিল ঋষি-অনুশাসিত আর্য্য-সমাজের সাধারণ বিধি। আর দ্বাদশ বর্ষ আচার্য্য-গৃহে বাস করিয়া উপনীতগণ যে শিক্ষা লাভ করিতেন, ইহাই ছিল ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম (Education period of an Aryan twice-born.)

আদর্শ-গৃহ বা আদর্শ-পরিবার গঠিত হয় আদর্শ মানুষদ্বারা। এইরূপে দ্বাদশ বর্ষ ব্রহ্মজ্ঞ গুরুর (ঋষি) গৃহে বাস করিয়া ঋষির অনুশাসন মানিয়া চলিয়া ও সাধনা করিয়া যে প্রজ্ঞা, প্রেম ও দেব-চরিত্র ব্রহ্মচারিগণ লাভ করিতেন তাহা মানুষের জীবনে একটা অতুল সম্পদ্। এই অতুল সম্পদের অধিকারী যখন ব্রহ্মচারিগণ হইতেন তখন তাঁহারা দ্বাদশ বর্ষান্তে সমাবর্ত্তন লাভ করিতেন। তখন তাঁহারা গৃহে প্রত্যা-বর্ত্তন করিয়া বিবাহ করিতেন এবং তাঁহাদের দ্বারা রচিত যে গৃহ তাহাকেই বলিত আদর্শ গার্হস্থ্যাশ্রম। এইরূপ ইষ্টপ্রাণ আদর্শ নর ও ইষ্টপ্রাণা আদর্শ নারী—যাঁহাদের এক-কথায় বলা যাইতে পারে দেব-দেবী, তাঁহারা তাঁহাদের এই সুখময় দাম্পত্য জীবনে দেবসন্তান লাভ করিয়া তাঁহাদের আদর্শ পারিবারিক জীবনের সূচনা করিতেন। এইরূপ বহু পারিবারিক জীবনের

ভিতর-দিয়া ঋষি-প্রবর্ত্তিত চতুরাশ্রমের ফলে এই দেশে আদর্শ সমাজ ও আদর্শ রাষ্ট্রের অভ্যুদয় হইত। আর্য্য সনাতন ধর্ম্ম-জীবনের এই চিত্রের ছাপ আমাদের মস্তকে নাই, তাই আমরা অজানা বহু ism-এর (বাদের) পিছনে ছুটি, আর কত কি বৈদেশিক রাজনীতির বুলি আওড়াই, কখনও বা পাশ্চাত্য সভ্যতার পিছু অন্ধ বিশ্বাসীর মত ছুটি ও আন্তর্জ্জাতিক খ্যাতি-লাভের আশায় নিজের জাতীয় কৃষ্টিকে উপেক্ষা ও অবজ্ঞা করি, আর বলি, ধর্ম্মই জাতির সর্ব্বনাশের কারণ। ভুলিয়া গিয়াছি যে গুরুবাদ অর্থাৎ জীবন্ত আদর্শবাদ বা ঋষিবাদ আমাদের ধর্ম্মের মূল ভিত্তি, ইহাকে উপেক্ষা করিয়া কোন উন্নতিই সম্ভবপর নয়। সর্ব্বলোকপূজ্য সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ এ সম্বন্ধে উদাত্ত কণ্ঠে বলিয়াছেন—

"উঠে-পড়ে লেগে যাও দেখি। গপ্প-মারা, ঘণ্টা-নাড়ার কাল গেছে হে বাপু, কার্য্য করতে হইবেক, দেখি বাঙ্গালীর ধর্ম্ম কতদূর গড়ায়।"

—স্বামী বিবেকানন্দ।

গুরুবাদ-প্রসঙ্গে বা অবতারগুরু-সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দ গভীর দৃঢ়তার সহিত বলিয়াছেন—

"ইহারা সকল গুরুরও গুরু, মানুষের ভিতর ভগবানের শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি। আমরা তাঁহাদের ভিতর-দিয়া ব্যতীত অন্য উপায়ে ভগবান্‌কে দেখিতে পারি না। আমরা তাঁহাদিগকে উপাসনা না করিয়া থাকিতে পারি না, আর কেবল ইহাদিগকে আমরা উপাসনা করিতে বাধ্য।

এই সকল নররূপধারী ঈশ্বর ব্যতীত ভগবানকে দেখিবার আমাদের আর কোন উপায় নাই।"

—স্বামী বিবেকানন্দ।

ধর্ম্মজীবনে অবশ্য স্বীকার্য্য অনুসরণীয় এবং পালনীয় বিষয় সম্বন্ধে শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র বলিয়াছেন—

পঞ্চবর্হি—একমেবাদ্বিতীয়ং শরণম্

পূর্ব্বেষামাপূরয়িতারঃ প্রবুদ্ধাঃ ঋষয়ঃ শরণম্

তদ্বর্ত্মানুবর্ত্তিনঃ পিতরঃ শরণম্

সত্ত্বানুগুণা বর্ণাশ্রমাঃ শরণম্

পূর্ব্বাপূরকো বর্ত্তমানঃ পুরুষোত্তমঃ শরণম্

এতদেবার্য্যায়ণম্

এস এব সদ্ধর্ম্মঃ

এতদেব শাশ্বতং শরণাম্।

অর্থাৎ—

একমেবাদ্বিতীয়ের শরণ লইতেছি

পূর্ব্বপূরণকারী প্রবুদ্ধ ঋষিগণের শরণ লইতেছি

তদ্বর্ত্মানুবর্ত্তী পিতৃগণের শরণ লইতেছি

পূর্ব্বাপূরক বর্ত্তমান পুরুষোত্তমের শরণ লইতেছি

ইহাই আর্য্যায়ণ

ইহাই সদ্ধর্ম্ম

আর ইহাই শাশ্বত শরণ্য।

সপ্তার্চ্চি—নোপাস্যমন্যদ্ ব্রহ্মণো ব্রহ্মৈকমেবাদ্বিতীয়ম্।
তথাগতাস্তদ্বার্ত্তিকা অভেদাঃ
তথাগতাগ্রো হি বর্ত্তমানঃ পুরুষোত্তমঃ।
পূর্ব্বেষামাপূরয়িতা বিশিষ্ট বিশেষ বিগ্রহঃ।
তদনুকূলশাসনং হ্যনুসর্ত্তব্যন্নেতরং।
শিষ্টাপ্তবেদপিতৃপরলোকদেবাঃ শ্রদ্ধেয়াঃ নাপোহ্যাঃ।
সদাচারা বর্ণাশ্রমানুগজীবনবর্দ্ধনা নিত্যং পালনীয়াঃ।
বিহিত সবর্ণানুলোমাচারাঃ পরমোৎকর্ষ হেতবঃ
স্বভাবপরিধ্বংসিনস্তু প্রতিলোমাচারাঃ।

অর্থাৎ—

ব্রহ্ম ভিন্ন আর কেহ উপাস্য নহে, ব্রহ্ম এক ও অদ্বিতীয়।
তথাগত তাঁর বার্ত্তাবহগণ অভিন্ন।
তথাগতগণের অগ্রণী বর্ত্তমান পুরুষোত্তম পূর্ব্ব-পূর্ব্বগণের
পূরণকারী বিশিষ্ট বিশেষ বিগ্রহ।
তদনুকূলশাসনই অনুসর্ত্তব্য—তদিতর কিছু নহে।
শিষ্টাপ্তবেদপিতৃপরলোকদেবগণ শ্রদ্ধেয়-অপোহ্য নহে।
বর্ণাশ্রমানুগ সদাচার জীবনবর্দ্ধনীয় নিত্যপালনীয়।
বিহিত সবর্ণানুলোমাচার পরমোৎকর্ষ হেতু
প্রতিলোমাচার স্বভাবপরিধ্বংসী।

বিশেষ চেষ্টা করিয়া ১৩৪০ সনে কাশী 'ভৃগুকার্য্যালয়' হইতে শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের জীবনের ভৃগু-পরিচয় আনা হয়। ভৃগুসংহিতার প্রতিটি কথা শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবনে এরূপ

আশ্চর্য্য রকমে অক্ষরে অক্ষরে ফলিতে দেখা যায় যে আর্য্য-ঋষিদের অপূর্ব্ব দর্শন-শক্তির কথা ভাবিয়া মুগ্ধ হইতে হয়। আর্য্য ঋষিদের এইরূপ অপূর্ব্ব দর্শনের পরিচয়ে অতীত আর্য্য গৌরবের কথা স্মৃতিপটে উদয় হইলে সারা বুকখানা আনন্দে উথলিয়া ওঠে, আর মনে হয়, আমরা কাহার সন্তান, আর আজ আমরা কোথায়—কোন আদর্শের পিছনে ছুটিয়াছি। তাই আজ ভারতে ঋষি বাদ দিয়া ঋষিবাদ অনুসরণের ফলে আর্য্যজাতি তাহার অস্তিত্ব হারাইতে বসিয়াছে।

শ্রীশ্রীঠাকুরের বর্ত্তমান জীবনের ভৃগুঋষি লিখিত ভাবফল-গুলি গ্রন্থকার রচিত "শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র" নামক জীবনী পাঠ করিলে সকলেই অবগত হইবেন। এখানে ভৃগু সংহিতায় লিখিত নবম স্তবক হইতে শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের পূর্ব্বজন্ম কথনের কয়েকটি ছত্র উদ্ধৃত করা গেল—

নবম স্তবক

শ্রীশ্রীভৃগুসংহিতা-বিবরণ

—'পূর্ব্বজন্ম-কথন' হইতে কয়েকটী ছত্র উদ্ধৃত।

আসীৎ পূর্ব্বভবে কশ্চিৎ মূর্দ্ধজ বঙ্গ খণ্ডকে।
স্বধূনী সমীপে জাত শ্যামাঙ্গ নাতিদীর্ঘকং॥
তৌর্য্যত্রিকং বৃথাট্যা চ বিদ্যাহীনঃ মহামতি।
গীতনাদে পরাপ্রীতি জনকেনৈব তাড়িতঃ।

অনশনে কদাচিৎ তু সতদা দুঃখ পীড়িতঃ।
দদর্শ চান্তিকে তাত বিধি প্রেরিত ইবানঘ ॥
সজ্জন সৌমকান্তিশ্চ করুণা পূরিতেক্ষণঃ।
তস্য কৃপাবিশেষেণ ক্বচিৎ সাধ্বী প্রযত্নতঃ ॥
ভৈরবী কৃপয়া শর্ম্মণ্ রাজদ্বারে দেবগৃহে।
পূর্ব্বভাগ্যবশাৎ কাব্য বিষ্ণুকৃপাপ্রভাবতঃ ॥
অংশাজ্জাতঃ যত শ্রীমান্ প্রাক্সংস্কার গৌরবাৎ।
স্বল্পযত্নে দেবীকৃপা প্রপাতূর্ণং মহামুনে ॥
তত্ত্বজ্ঞানী ষোড়শাচ্চ খনেত্রাৎ মুনিসত্তম।
মহাতত্ত্ব সুখং প্রাপ্য সর্ব্ব আশা বিনির্ম্মুখঃ ॥
পরমহংস পদারূঢ় জন্মজন্মান্তরার্জ্জিতঃ।
সমদর্শীঃ মহাভাগঃ অভেদঃ লোষ্ট্রী কাঞ্চনে ॥
বিত্তমধ্যে রুচির্নৈব দারপঙ্কাৎ পৃথক পুনঃ।
পিত্রোপঙ্কাৎ পৃথক্চৈব সংসারাচ্চ পৃথক্ অভূৎ।
নারী চিন্তা ন বৈ স্বপ্নে মাতৃবৎ পশ্যতি স্বতঃ।
মাতৃভাবাৎ মহাসিদ্ধি বহু শিষ্য সুবেষ্টিতঃ ॥
অপূর্ব্ব তস্য চেষ্টাপি মূর্খোপি তত্ত্বভাষকঃ।
স্বল্পধ্যানে মহাপ্রাজ্ঞঃ গূঢ়তত্ত্বার্থ তত্ত্ববিৎ ॥
সমাধৌ চ বাধা তাত প্রমদা কাঞ্চনাদিভিঃ।
স্পর্শমাত্রে বিকৃতাঙ্গ শূলবিদ্ধবৎ তদা ॥
এবং বিচেষ্টিতং তস্য কদাপি সময়ে মুনে।
ব্রহ্মবার্ত্তা দদৌ শূদ্রে অচানক স্নেহযোগতঃ ॥

শক্তিহীনোঽভবৎ তস্মাৎ গলরোগাৎ মৃতোত্তরে।
যাবজ্জীবং যোগীশ্রেষ্ঠ ভূপাৎ তাত শনৈঃ সুখম॥
রামাৎরামে যথা তেজঃ এবং তস্য মহামুনে।
পুনর্জ্জন্ম ধরাপৃষ্ঠে বিস্মৃতা পূর্ব্বগৌরব॥

ভৃগু সংহিতা হইতে উপরোক্ত মহর্ষি ভৃগু-প্রদত্ত শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের পূর্ব্বজন্ম-পরিচয় পাঠ করিলে দেখা যায়, তিনি পূর্ব্ব জন্মে বঙ্গ প্রদেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি ছিলেন বিদ্যাহীন ও মহামতি এবং গীতনাদ তাঁহার বিশেষ প্রীতির বিষয় ছিল। ইহার জন্য পিতামাতা কর্ত্তৃক তাড়িত হইতেন। দুঃখ-পীড়িত মনে কখন কখন আশ্রয়হীনের ন্যায় উপবাসী থাকিতেন। তথাপি তিনি তাঁহার সাধনা হইতে বিরত হন নাই। স্বল্প যত্নে তিনি গূঢ় তত্ত্বজ্ঞান লাভ করেন এবং দেবীর কৃপালাভ করিয়াছিলেন। পার্থিব সকল সুখ-শান্তির আশা ত্যাগ করিয়া ঐকান্তিক সাধনার বলে পরমহংসপদে আরূঢ় হইয়াছিলেন। তাঁহার নিকট লোষ্ট্র ও কাঞ্চনে কোন প্রভেদ ছিল না—তিনি উভয় জিনিসকেই সমান চোখে দেখিতেন। পার্থিব ধনের আকাঙ্ক্ষাই তাঁহার ছিল না। তিনি পিতামাতা ও সংসার হইতে পৃথক ছিলেন। স্বপ্নেও কখনও নারী-চিন্তা করিতেন না, এবং সকল নারীকেই তিনি স্বতঃই মাতৃবৎ

দেখিতেন। মাতৃভাবের সাধনায় তাঁহার মহাসিদ্ধি লাভ হইয়াছিল; তিনি বহুশিষ্য-পরিবেষ্টিত হইয়া আসীন থাকিতেন। তাঁহার অপূর্ব্ব চেষ্টায় মূর্খও তত্ত্বকথা বলিতে সমর্থ হইয়াছিল। তিনি অল্প ধ্যানেই মহাপ্রাজ্ঞ ও গূঢ় তত্ত্ববিদ্ হইয়াছিলেন। কখনও কোন প্রকারে তাঁহার অঙ্গে কাঞ্চন স্পর্শ করাইলে তাঁহার অঙ্গ বিকৃত হইত এবং তিনি শূলবিদ্ধবৎ ব্যথা অনুভব করিতেন। অবশেষে অপূর্ব্ব স্নেহের বশবর্ত্তী হইয়া শূদ্রকে ব্রহ্মবার্ত্তা অর্পণ করার ফলে তিনি গলরোগাক্রান্ত ও অসুস্থ হইয়া পড়েন এবং তাঁহার মৃত্যু হয় ইত্যাদি।

মহর্ষি ভৃগু-প্রদত্ত শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের পূর্ব্বজন্মের এই পরিচয় পাঠ করিলে নিঃসন্দেহে ও নির্ব্বিচারে বলা যায় যে, তিনি পূর্ব্বজন্মে সর্ব্বজনপূজ্য ভগবান্ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব রূপে এই বঙ্গ প্রদেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ভগবান্ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব গত ১২৯৩ সালে দেহত্যাগ করেন এবং শ্রীশ্রীঠাকুর ১২৯৫ সালে ৩০শে ভাদ্র, শুক্রবার, তালনবমী তিথিতে উত্তরবঙ্গে পাবনা জেলা-টাউনের নিকটবর্ত্তী হিমাইৎপুর গ্রামে ৺শিবচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর ঔরসে মাতা ৺মনোমোহিনী দেবীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন।

এই প্রসঙ্গে ভগবান্ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের শ্রীমুখনিসৃত নিম্নলিখিত কতিপয় বাণী পাঠ করিয়া সশ্রদ্ধভাবে চিন্তা করিলে সকলেই এসম্বন্ধে অতি সহজেই অভ্রান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছাইতে পারিবেন। আমার ধারণা কোন বিষয়ে গোঁড়ামীর

বশবর্ত্তী না হইয়া তাহা সুষ্ঠুভাবে চেষ্টা করা উচিত। তাহাতে অনেক সময় ভুলের সংশোধন হয়।

ভগবান্ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব বলিয়াছেন—"আর একবার আসতে হবে, তাই পার্ষদদের সব জ্ঞান দিচ্ছি না।"

—শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত, ৪র্থ ভাগ পৃঃ ৬০

উপরোক্ত এই বাণীদ্বারা আমরা বিশ্বাস করিতে পারি যে তিনি আর একবার আসিবেন।

দেখা যায়, তিনি আর একবার বলিয়াছেন—"বায়ুকোণে আর একবার আমার দেহ হবে।"

—কথামৃত ৪র্থ ভাগ, পৃঃ ৩১৪

এই বাণীতে পরিষ্কারভাবে পাওয়া যাইতেছে যে তিনি আর একবার জন্মগ্রহণ করিবেন বটে কিন্তু তাঁহার জন্মস্থান হইবে বায়ুকোণে।

তারপর শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত ৪র্থ ভাগে ১৩৪ পৃষ্ঠায় দেখা যায় যে, তিনি বলিয়াছেন—"কলির শেষে কল্কি অবতার হবে—ব্রাহ্মণের ছেলে",—এই বাণীতে আমরা পাইতেছি যে কলির শেষ অবতার কল্কি অবতার এবং তিনি ব্রাহ্মণ-পরিবারে জন্মগ্রহণ করিবেন।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব যে ভগবান্—তাহা ভারত এবং বহির্ভারতের অসংখ্য নরনারী বিশ্বাস করেন। বর্ত্তমান সিনেমা-জগতেও তাঁহাকে অবতার বলিয়া প্রচার করা হইতেছে। তাঁহারই শ্রীমুখনিসৃত বাণী যে তিনি আর একবার বায়ুকোণে আসিবেন এবং কলির শেষ অবতার ব্রাহ্মণের

ছেলে হইয়া। তাঁহার শ্রীমুখনিসৃত এই সকল বাণী একত্র করিয়া সশ্রদ্ধভাবে চিন্তা করিলে অবাধে এবং প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করা যায় যে, ভগবান্ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব উত্তরবঙ্গে এক ব্রাহ্মণ-পরিবারে পুনরায় জন্মগ্রহণ করিবেন এবং তাঁর এই জন্মে তিনি শাস্ত্রোক্ত কল্কি-অবতাররূপে সর্ব্বত্র পূজিত হইবেন। ভগবান্ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবকে যাঁহারা অবতার বলিয়া বিশ্বাস করেন তাঁহারা এবিষয়ে নিঃসন্দেহ হইতে পারেন। সুতরাং মহর্ষি ভৃগু-প্রদত্ত শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের পূর্ব্বজন্মের পরিচয় যাহা পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে তাহা স্বয়ং ভগবান্ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের বাণী দ্বারাই সমর্থিত হইল দেখা যাইতেছে।

অনেকে বলিয়া থাকেন যে, কলির এখনও শেষ হইবার বহু বিলম্ব আছে, সুতরাং এসময় কোন অবতারের বা কল্কি অবতারের আবির্ভাব হইতে পারে না। এই ভ্রান্ত ধারণা দূরীকরণের জন্য ভগবান্ যীশুখৃষ্টের কয়েকটি বাণী পাঠকবর্গের সম্মুখে উপস্থাপিত করিতে চাই :—

(1) The desciples came unto him privately saying, "Tell me what is the sign of thy coming and the end of the world ?—3,24 Mathew.

বঙ্গানুবাদ—শিষ্যগণ তাঁহার নিকট (যীশুখৃষ্টের নিকট) নিভৃতে আগমন করতঃ বলিলেন—"জগতের শেষ হইবার এবং আপনার পুনরাগমনের চিহ্ন কি ?

(2) Jesus answered and said unto them—"Take heed that no man deceive you"—4. 24 Mathew.

বঙ্গানুবাদ—যীশুখৃষ্ট প্রত্যুত্তরে বলিলেন—"তোমাদিগকে কেহ প্রতারণা না করে তৎপ্রতি মনোযোগ দিবে।

(3) For many shall come in my name saying—"I am Christ, and shall deceive many." 5. 24 Mathew.

বঙ্গানুবাদ—কারণ আমার নাম দিয়া অনেকের আবির্ভাব হইবে এবং তাহারা প্রকাশ করিবে—"আমি যীশুখৃষ্ট এবং এইরূপে অনেকে প্রতারণা করিবে।"

(4) "And ye shall hear of wars and rumour of wars. See that ye be not troubled for all these things must come to pass, but the end is not yet."— 6. 24 Mathew.

বঙ্গানুবাদ—তোমরা যুদ্ধ এবং যুদ্ধের জনরব শ্রবণ করিবে, এই সকল অবশ্য ঘটিবে, তাই তোমরা বিব্রত হইও না, কিন্তু ইহাই শেষ নয়।

(5) For nation shall rise against nation and kingdom against kingdom and there shall be famines and pestilences and earthquakes in diverse places."— 7. 24 Mathew.

বঙ্গানুবাদ—কারণ, এক জাতি আর এক জাতির বিরুদ্ধে

এবং এক রাজ্য আর এক রাজ্যের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইবে এবং বিভিন্ন স্থানে দুর্ভিক্ষ, মড়ক ও ভূমিকম্প হইবে।

(6) "All these are the beginning of the sorrows. —11. 24 Mathew.

বঙ্গানুবাদ—এই সকল দুঃখদৈন্য আরম্ভ হইবার সূচনা মাত্র।

(7) "Now the brother shall betray brother to death and the father the son and children shall rise against their parents and shall cause them to be put to death."— 12. 13 Mark.

বঙ্গানুবাদ—এই সময় কৃতঘ্নতার বশবর্ত্তী হইয়া ভ্রাতা ভ্রাতাকে, পিতা পুত্রকে হত্যা করিবে, এবং সন্তানগণ তাহাদের পিতামাতার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইবে এবং তাহাদের মৃত্যু ঘটাইবে।

(8) "For as the lightning cometh out of the east and shineth even unto the west; so shall also the coming of the son of man be"— 27. 24. Mathew.

বঙ্গানুবাদ—কারণ, যেমন বিদ্যুৎ পূর্ব্ব হইতে আসে এবং পশ্চিম পর্য্যন্ত বিভাবিত হয়, তদ্রূপ ঈশ্বরের তনয়েরও আবির্ভাব হইবে।

ভগবান্ যীশুখৃষ্টের উপরোক্ত বাণী-সমূহে তাঁহার বা অবতারের পুনরাগমনকালের যে মর্ম্মন্তুদ ও ভয়াবহ সমাজচিত্র

পাওয়া যায় তাহার সহিত বর্ত্তমান জগতের পরিস্থিতির তুলনা করিলে দেখা যায় যে, উক্ত মর্ম্মন্তুদ ও ভয়াবহ চিত্র বর্ত্তমান-জগতের পরিস্থিতিতে সম্পূর্ণভাবে প্রকট হইয়াছে।

শুনা যায়, হাদিসে আছে যে হজরৎ মহম্মদ নাকি বলিয়াছেন যে, তিনি নমাজ আরম্ভের পূর্ব্বে যে আজানের প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন উক্ত আজানের আওয়াজ যতদূর পর্য্যন্ত শ্রুত হইবে ততদূর পর্য্যন্ত কোন মসজিদ নির্ম্মিত হইতে পারিবে না এবং যখন দেখা যাইবে মুসলমানগণ এই নীতি ভঙ্গ করিয়াছেন তখনই জানিবে, প্রেরিতের আবির্ভাবের সময় হইয়াছে।

তারপর জগতের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে ইহা বোধহয় কাহাকেও দেখাইয়া দিতে হইবে না যে, মুসলমানগণ আজানের শব্দ যতদূর পর্য্যন্ত শ্রুত হয় ততদূরের মধ্যে এক মসজিদের পরিবর্ত্তে কত মসজিদ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। তারপর টাকায় একসের চাউল বিক্রয়ের প্রত্যক্ষ দ্রষ্টার অভাব বর্ত্তমান জগতে নাই। নদীর মধ্যস্থানে চর এবং কিনারা দিয়া স্রোত প্রবাহ বহুদিন ধরিয়া সকলে দেখিয়া আসিতেছেন। সুতরাং কলি শেষ হইবার বা কল্কি-অবতারের আবির্ভাবের সময় হইয়াছে তাহা উপরোক্ত অবতার, প্রফেট, পয়গম্বরগণের বাণী ও শাস্ত্রাদির দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করা যায়। অতএব যাঁহারা বলেন যে অবতারের বা ভগবান্ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের বা মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গদেবের পুনরাগমনের এখনও সময় হয় নাই তাঁহাদের কথা আদৌ বিশ্বাসযোগ্য নয়।

এখন উপরোক্ত বিষয়গুলি দ্বারা ইহা প্রত্যক্ষভাবে প্রমাণিত হইল যে, কল্কি-অবতারের আবির্ভাবের সময় হইয়াছে।

এই প্রসঙ্গে আমার মনে হয়, বর্ত্তমান যুগপুরুষোত্তম শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের কথা কিছু এখানে উল্লেখ না করিলে বিষয়টি অঙ্গহীন হইবে। তাঁহার কথা লিখিতে গেলে স্মৃতিপটে অফুরন্ত বিষয় আসিয়া উদয় হয় কিন্তু পাঠকবর্গের ধৈর্য্যের বিষয় চিন্তা করিয়া যাহাতে এই প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি না হয় তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিয়া মাত্র তাঁহার ভাববাণীর কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত করিব।

সে আজ প্রায় ৪০ বৎসর আগের কথা। শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র স্থানীয় সঙ্গীগণ লইয়া এক কীর্ত্তনের দল গড়িলেন। পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম-সমূহ হইতে দলে দলে শত শত লোক আসিয়া তাঁহার কীর্ত্তনে যোগদান করিতে লাগিল। গ্রামবাসীদিগকে লইয়া তিনি সর্ব্বদা উদ্দাম কীর্ত্তনে মত্ত থাকিতেন। এইরূপে তাঁহার প্রেমিক স্বভাব ও দেব-চরিত্রবলে সকলের অন্তঃকরণে নারকীয় ভাবের পরিবর্ত্তে এক অপূর্ব্ব ধর্ম্মভাবের সৃষ্টি করিলেন। তিনি ভাবাবেশে মাতোয়ারা হইয়া কীর্ত্তন করিতে করিতে কখনও কাহাকেও আলিঙ্গন করিতেন, কখনও কাহাকেও নিজ স্কন্ধে লইয়া তাণ্ডব নৃত্য করিতে করিতে কীর্ত্তন করিতেন। কীর্ত্তনকালে তাঁহার অপূর্ব্ব ভঙ্গিমা, ভাব-বিহ্বল মূর্ত্তি, সুমধুর কণ্ঠস্বর, অশ্রুবর্ষণ এবং কখনও তাঁহার শরীরের লোমকূপ হইতে আশ্চর্য্যভাবে রক্তনির্গমন দেখিয়া লোকে অবাক্ হইয়া তাঁহাকে জীবন্ত দেবতা বোধে তাঁহার

শ্রীপাদপদ্মে আত্মোৎসর্গ করিতে লাগিল। কীর্ত্তন শ্রবণমাত্র তিনি অস্থির হইয়া পড়িতেন এবং তৎক্ষণাৎ কীর্ত্তনে যোগদান করিতেন। কিছু সময় পরে নৃত্য করিতে করিতে এক অপূর্ব্ব ভাবের প্রকাশ পাইত। তিনি বাহ্যজ্ঞানহীন হইয়া মাটির উপর পড়িয়া যাইতেন, তখন যোগশাস্ত্রোক্ত বহু প্রকার আসন মুদ্রা প্রকাশ পাইত। কখনও তিনি তাঁহার একমাত্র বৃদ্ধাঙ্গুলের উপর সমস্ত শরীরের ভার দিয়া দাড়াইতেন। কখনও পদ্মাসন, বীরাসন, কুর্ম্মাসন প্রভৃতি বহু প্রকারের আসনাদি করিতেন। দেখিলে মনে হইত যেন তাঁহার শরীরের অস্থির কোন অস্তিত্ব নাই—কেবল মাংসপিণ্ড মাত্র। তিনি জীবনে কোন দিন কোনরূপ আসনাদি করিয়া নামধ্যান করেন নাই কিন্তু ঐ সময় তিনি অভ্যস্ত ব্যক্তির ন্যায় অতিশয় ক্ষিপ্রতার সহিত এইরূপ আসনাদি করিতেন, সে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য।

এইরূপ আসনাদির পর তিনি ঠিক শবের ন্যায় মাটিতে পড়িয়া থাকিতেন। তখন প্রথমতঃ তাঁহার দক্ষিণ পদের বৃদ্ধাঙ্গুলি কিছু সময় কাঁপিয়া স্থির হইতে দেখা যাইত। তারপর তাঁহার সমস্ত বাহ্যজ্ঞান লোপ পাইত। তখন দেখা যাইত, তাঁহার চোখের তারা স্থির, হৃদপিণ্ড ও শ্বাসযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ, সমুদয় শরীর বরফের ন্যায় শীতল ও শক্ত, ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাঁহার এইরূপ অবস্থা দর্শনে আত্মীয়-বন্ধুবান্ধব শোকার্ত্ত হইয়া কান্দিতে থাকিতেন। ডাক্তার তাঁহার এই অবস্থা দেখিয়া পরীক্ষা করিয়া তাঁহাকে মৃত বলিয়া অভিমত

প্রকাশ করিয়াছেন। সন্দিগ্ধ, অবিশ্বাসী ও দুষ্ট চরিত্রের লোক পরীক্ষার্থে কাষ্ঠের আগুন ও টীকা পোড়াইয়া তাঁহার শরীরের বিভিন্ন স্থানে লাগাইত, তাহাতেও তাঁহার কোনরূপ চেতনা আসিত না। এইরূপ বাহ্যজ্ঞানহীন অবস্থায় যখন মৃত্যুর লক্ষণ-সমূহ বর্ত্তমান তখন তাঁহার শ্রীমুখ হইতে ধর্ম্মতত্ত্ব, অবতারবাদ, সৃষ্টিতত্ত্ব, জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্ম প্রভৃতি নানা বিষয়ের বাণী বহির্গত হইত। উক্ত বাণী-সমূহের মধ্যে উপস্থিত ব্যক্তি-গণের অনেকের মনের প্রশ্নোত্তর ও জগতের অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ অবস্থার বর্ণনা থাকিত। মোট এইরূপ একাত্তর দিনের বাণী একত্রে সমাবেশ করিয়া পুনাপুঁথি নামক একখানি পুস্তকে মুদ্রিত করিয়া প্রকাশ করা হইয়াছে।

আমি সকলকেই সশ্রদ্ধভাবে বলিতে চাই যে ভগবান্ নরদেহে অবতীর্ণ হন আমাদের প্রয়োজনের পরিপূরণে—আমাদের বাঁচাতে—আমাদের গড়িতে, আর আমরা ব্যক্তিগত অহঙ্কার, আভিজাত্য ও গোঁড়ামীর বশবর্ত্তী হইয়া যতবার তিনি নরদেহে অবতীর্ণ হইয়াছেন ততবারই আমরা তাঁহাকে তাঁহার জীবদ্দশায় উপেক্ষা করিয়াছি, নিন্দা করিয়াছি, অত্যাচার ও উৎপীড়ন করিয়াছি—এমন কি কখনও প্রহার করিতে বা হত্যা করিতেও কুণ্ঠিত হই নাই। কিন্তু তাঁহাদের মহাপ্রয়াণের পর তাঁহাদের প্রত্যেকের জন্য ব্যাকুল হইয়া কতই না ক্রন্দন করিয়াছি—কত ব্যাকুলকণ্ঠে তাঁহাদের পুনরাগমনের জন্য আজীবন আহ্বান করিয়াছি এবং এখনও করিয়া থাকি। এই মজ্জাগত পুরাতন ভুলের পুনরাবৃত্তি যাহাতে সকলে আর

এবার না করেন—তাঁহাকে জীবদ্দশায় গ্রহণ ও অনুসরণ করিয়া প্রত্যেকের জীবনকে সার্থক করিতে পারেন—নিজের পরিবার, পরিবেশ, দেশ ও কৃষ্টিকে যাহাতে বাঁচাতে পারেন সেইজন্যই এত সংখ্যক প্রমাণ আপনাদের সকলের সম্মুখে আজ আমি উপস্থাপিত করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছি। এই প্রসঙ্গে যুগপুরুষোত্তম শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের কয়েকটি বাণী নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি :—

১। "অহংকে যত দূরে রাখবে, তোমার জ্ঞানের বা দর্শনের পাল্লা তত বিস্তার হবে।" —শ্রীশ্রীঠাকুর।

২। "যদি পরীক্ষক সেজে অহঙ্কার নিয়ে সদ্‌গুরু কিম্বা প্রেমী সাধু-গুরুকে পরীক্ষা করতে চাও তবে তুমি তাহাতে তোমাকেই দেখবে, ঠকে আসবে।" —শ্রীশ্রীঠাকুর।

৩। "তাঁকে অহংএর কষ্টিপাথরে কষা যায় না, কিন্তু তিনি প্রকৃত দীনতারূপ ভেড়ার শিংয়ে খণ্ডবিখণ্ড হন।"

—শ্রীশ্রীঠাকুর।

৪। "হীরক যেমন কয়লা প্রভৃতি আবর্জ্জনায় থাকে, উত্তমরূপে পরিষ্কার না করলে তার জ্যোতি বেরোয় না, তিনিও তেমনি সংসারে অতি সাধারণ জীবের মত থাকেন, কেবল প্রেমের প্রক্ষালনেই তাঁর দীপ্তিতে জগৎ উদ্ভাসিত হয়। প্রেমীই তাঁকে ধরতে পারে। প্রেমীর সঙ্গ কর, সৎসঙ্গ কর, তিনি আপনিই প্রকট হবেন।" —শ্রীশ্রীঠাকুর।

৫। "অহঙ্কারীকে অহঙ্কারী পরীক্ষা করতে পারে।

গলিত অহংকে কি ক'রে সে জানতে পারবে? তার কাছে একটা কিম্ভূতকিমাকার—যেমন অজমূর্খের কাছে মহাপণ্ডিত।"

—শ্রীশ্রীঠাকুর।

তাই আজ সকলের নিকট আমার ব্যকুল আবেদন, এই বিশ্বধ্বংসী মহাপ্রলয়ের সম্মুখে আমরা বিশ্বগুরু যুগপুরুষোত্তম জীবন্ত বিগ্রহ শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রকে পাইয়াছি যুগত্রাতারূপে। আজ এই যুগসন্ধিক্ষণে আসুন আমরা ব্যক্তিগত আভিজাত্য ও অহঙ্কার ত্যাগ করিয়া, সকল রকমের প্রাদেশিকতা, জেলাভিত্তিকতা, শ্রেণীবিরোধ ও সম্প্রদায়গত বিভেদ ভুলিয়া জাতির গৌরব আর্য্য ঋষিদের প্রতি—পূর্ব্ব-পূর্ব্ব গুরু বা অবতারগণের প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়া সমগ্র বিশ্বে এক বিশ্ব-মন্দির গড়িয়া তুলি এবং তথায় জীবন্তবিগ্রহ যুগপুরুষোত্তম শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রকে প্রতিষ্ঠা করিয়া তাঁহার পুণ্য পাদপীঠে আসুন সমগ্র বিশ্ববাসী সমবেত হই এবং সমগ্র বিশ্ব জুড়িয়া সমবেত কণ্ঠে ধ্বনিত হউক—"জয় যুগপুরুষোত্তম শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র কি জয়।"

বন্দে পুরুষোত্তমম্